পাটরানী

আলাউদ্দিন আল আজাদ

একটি রেমাশ নিবেদন

শুভম

লিপ্তন

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999

পাটরানী

[নবপাস প্রকাশিত একটি উপন্যাস]

পাটরানী

আলাউদ্দিন আল আজাদ

বাংলা একাডেমী সাহিত্য সংসদ ঢাকা

[স্বত্ব] গ্রন্থকার

প্রচ্ছদ মুদ্রণে
ইমপ্রেশন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন
ফরিদাবাদ ঢাকা ৪

[নসাস-১২৯]

প্রকাশনায়
নওরোজ সাহিত্য সংসদ ঢাকা'-র পক্ষে
ইফতেখার রসুল জর্জ
৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮৬

বৈশাখ ১৩৯৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সৈয়দ ইকবাল

মুদ্রণে
নিউ সোনালী প্রিন্টার্স
১১/১২ নবরায় লেন
সলামপুর ঢাকা ১

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

শিল্পরসিক, সাহিত্য প্রেমিক
শিক্ষা ও সংস্কৃতি সচিব
কাজী জালালউদ্দিন আহমদ
করকমলে—

আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর ক'টি গ্রন্থ

ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র
খসড়া কাগজ
কর্ণফুলী

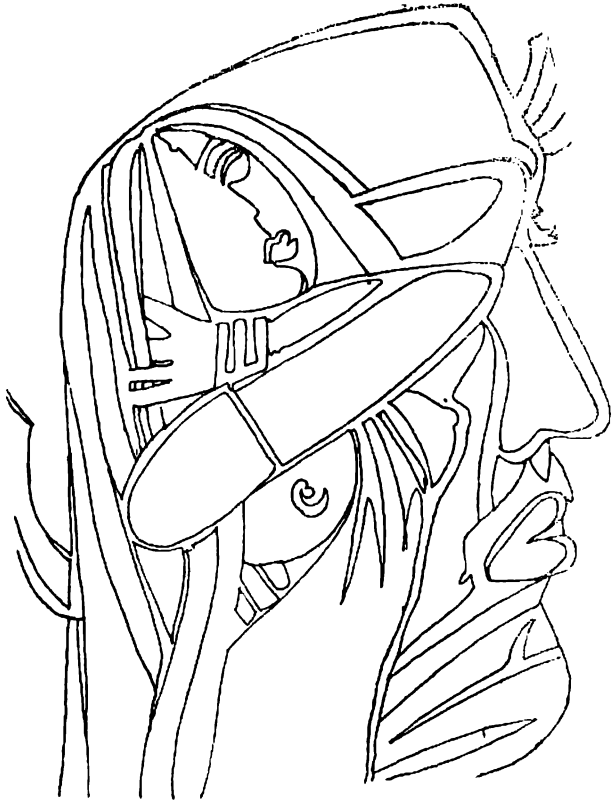

পাটরানী/আলাউদ্দিন আল আজাদ

এখানে মেঘনা যদিও দক্ষিণের সুদূরে ভাটিতে সাগরমোহনার মতো অসীম বাঁধনহারা নয়, তবু এখন এই ভরা শেষ শ্রাবণের মেঘভরা আসমানতলে আধো ছায়ার যেমন থইথই করছে, তাও নেহাত কম ডর আনে না। ঠিকমতো ডাকাল গা ছমছম করে। দিনের বেলায় ধবল পানিস্রোত [illegible] চলে [illegible] রূপোর। ছোটবড় চউ [illegible] কি [illegible] সবকিছুই বদলে যায়। [illegible] পুরের উজানে গ্রাম, গাছগাছালি [illegible] ওদিকে [illegible] উঁচু মিনারের মতো সাইলো, নতুন দালানকোঠার সারি। [illegible] কর্মচারী কলোনী, একান্ত সরকারখানা। সন্ধ্যের সময় থেকে আলোকমালা ঝলমল করে জ্বললেও হঠাৎ কোনো কারণে যদি বাতি নিভে যায়, তখন [illegible] এবং বাত ও বৃষ্টি থাকে তো আরো মুশকিল। দুটি গাঙের এপার-ওপার, সামনে-পিছনে, দারুন বর্ষায় ভাসমান জবুথবু কুঁড়ে চালাঘরে দেহাতী বুকের ভিতরে হৃৎপিন্ড ধুক্‌পুক্‌ করে। [illegible] অন্ধকার। যেনো অন্ধকারও নয়, নিকষ কালো কালির জোয়ার। এদিক-ওদিক ছড়ানো টিমটিমে কুপি ও হারিকেন মানব-অস্তিত্বের প্রমাণ জানায় বটে, কিন্তু তবু যেন ঠিক ভরসা দেলে না।

কিন্তু একজন আলাদা আদমী, এবং সে ইয়াকুব মাঝি। যে-কোনো পরিস্থিতিতে তার মুখের থমথমে নির্বিকার ভাবটা অদ্ভুত। অনেকের কাছেই অসহ্য মনে হয়। সে হাসেও না, কাঁদেও না। কখনো উত্তেজিত হয় না। তার স্বভাবটা যেনো মাটির মতো; কিন্তু মাটির ভিতরে যে গনগনে আগুন থাকে, কখনো কখনো যার বহিঃপ্রকাশ লাভাস্রোত ও অগ্ন্যুৎপাত, সেরকম কিছু তার মধ্যে আছে কিনা কেউ জানে না। তবে মাইনষে কয়, তার বুকটা যেমন ভাসনা, তেমনি তার দিল্‌ কইলজাটাও বহুত ডাঙর। সেজন্য কখনো ভয় পায় না। অমাবস্যার সময়ে খামারের গোরস্থানের কাছে তেতুলগাছতলা দিয়ে যেতে যেতে

ভূতের সাথে কথা বলার তার অভিজ্ঞতা আছে। আর একবার নাকি মাঝরাতে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে মাছখাউরি পেত্নীর কবলে পড়ে তার চুল ধরে টানটানি করেছিলো।

ইয়াকুব মাঝির বয়স যে খুব বেশি হয়েছে তা নয়, হিসেব মতে পঞ্চান্নের কাছাকাছি। কিন্তু কালের ছাপটা সে তুলনায় একটু বেশি। কপালে বলিরেখা, বিশেষ চোখজোড়া, কোটরের ভিতরে চলে গেছে: সেখান থেকে তার বিষণ্ণ গভীর অপলক চাউনিটি অত্যন্ত মারাত্মক। দূরবর্তী চরাঞ্চলে ও গাঙের বাঁকে জঙ্গলের কাছে, দু'একটা খুন-খারাবী করেছে বলে, কানাঘুষা আছে। আরে থোঃ। মাইন্‌ষের কথা, ব্যাঙের মাথা: মিথ্যারে কয় সত্য, সত্যেরে কয় মিথ্যা; সেসবের আবার কোনো দাম আছে নাকি?

ছোটবেলা থেকে, জীবনপথে চলতে গিয়ে, কতো কথা শুনেছে ইয়াকুব, তার লেখাজোখা নেই এবং কখনো কখনো, কথার প্রবাহের মধ্য দিয়ে ভেসে গেছে। তবে হিটলারের যুদ্ধের সময় জাপানীরা যখন কলিকাতায় বোমা ফেললো, আর ইদিকে চাটগাঁর দিকে এগুতে লাগলো, তখন কথা কম ছিলো। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময়ে কথা আরো রইলো না, থাকলো কিছু হাহাকার গোঙানি ও চিৎকার। তারপর রায়ট হলো: ঘরবাড়ি পোড়ানো, ছোরা মারামারি। বাংলা মায়ের দু'টি ছেলে, ভাইয়ের রক্তে তাই হাত লাল করলো। তখন কি বাহাদুরী! মওকা বুঝে দেশটাকে ভাগাভাগি করে নেয় সুযোগ-সন্ধানী শোষক শ্রেণী; আর তাদের মুখে কতো বোলচাল! কথা শুনেছে, অনেক কথা। সবকথা বুঝতে পারতো না, কিন্তু কিছু-কিছু এমনভাবে বুঝতো যে, সেসব মনের মধ্যে থরে-থরে জমা হয়ে আছে।

তার নিজের ব্যাপার কিছুটা অন্যরকম, সেজন্য কাউকে দোষারোপ করে না। বড় হওয়ার পর থেকে কতবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, নিরুদ্দেশ হয়ে থেকেছে মাসের পর মাস। পশ্চিমে গেছে সে আজমীর শরীফ, করাচী লাহোর। পুবে খাসিয়া জৈন্তিয়া। উত্তরে তেতুলিয়া, সেখান থেকে হিমালয় পর্বতের ছায়া দেখেছে; এবং দক্ষিণে টেকনাফ।

সুতরাং তার সম্পর্কে উল্টাপাল্টা কথা হবে এতো স্বাভাবিক। যে যাই বলুক, ইয়াকুব নিজে অক্ষরে-অক্ষরে জানে তার জীবনের অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস।

সে ইতিহাস যেন শুধু আজকের নয়—বহুকালের, যুগযুগান্তের পুরাতন। অচেনা ও আদিম।

তার পূর্বপুরুষেরা কি ছিলো, বনমানুষ? নইলে প্রায়ই ঘোর নিশুতিরাতে, একটি খোয়াবই বারবার কেন ফিরে আসে। ঘাড়ভরতি বাবরিচুল পেশল বাহুতে উত্তাল শিহরণ চোখা পাথরমুখ বল্লম উঁচিয়ে ছুটে চলেছে একটা হিংস্র বিদঘুটে জন্তুর পিছনে, যে তার পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরের কাছে এসে ঘাপটি মেরে থাকে আক্রমণ করার জন্য: কেমন উদ্ভট জানোয়ারটি কুতকুতে চাউনি। লোমশ শরীর। হামাগুড়ি দিয়ে সরীসৃপের মতো। স্বপ্নতো? স্বপ্নই! ভেঙে গেলে শেষ, কিন্তু এই স্বপ্নটা অন্যরকম, এই স্বপ্ন ভাঙার পরেও তার ঘোর কাটতে চায় না। ঘরের ভিতরে যেন ওই জন্তুটির গায়ের গন্ধ বাতাসে বয়ে চলে অনেকক্ষণ ধরে, এবং আশ্চর্য তার মনে হয়, অবশ্য অস্পষ্ট, এই জন্তুটাকে দেখে আসছে, একেবারে শৈশব থেকে, বিভিন্নরূপে, ভিন্ন চেহারায়। সময়ের তালে তালে পাল্টে চলেছে নিজেকে, কিন্তু কাছে কাছেই আছে। তার বংশও বৃদ্ধি করেছে, যেন আরো বেশি নৃশংস সন্তানসন্ততি।

এখনো বিপরীত স্রোত ও বাতাসে বৈঠা বাইতে-বাইতে আচ্ছন্ন ইয়াকুব মাঝি, ব্রহ্মপুত্রের মোহনার কাছাকাছি এসে হঠাৎ চমক ভাঙলো যখন নৌকাটা প্রায় কাত হয়ে যায়, হেলতে দুলতে থাকে এবং সোয়ারীরা হুঁশিয়ার। ওরা নড়েচড়ে বসলো, কেউ বাতায় ধরে, কেউবা ছইয়ের খাপে। আনাজবেপারী মোন্তাজ হই হই করে উঠল, 'কি অইল ইয়াকুব ভাই'—

'আইবো আবার কি, চুপ মাইরা থাকু।' বৈঠাতে একটা জোর মোচড়ে ডিঙির সামনেটা সিধা করে ইয়াকুব বলল, 'তুফান আইতাছে'—

'তুফান আইতাছে, আরে কওকি চাচা।' বেশ ব্যতিব্যস্ত বিড়ির কারিগর ইন্নাস, ছইয়ের কিনারা ধরে টাল সামলাতে-সামলাতে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বলল, 'আমরা কয়জন দাঁড় ধরুম্‌নি?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে থুথু ফেলে ইয়াকুব মাঝি, মেঘে ভরা বিজলি-চমকানো আসমানের দিকে আরেকবার তাকিয়ে বলল, 'রাখ্ ভাই জা। তরা বাইবি দাঁড়, তাইলেই অইছে—আমার নাও তাইলে পানিস্বর গিয়া উঠব, হেঃ হেঃ হেঃ। কিছ্‌ছু ভাবিস্‌না, বইয়া বইয়া চুরুট্ টান'

মুরগিওয়ালা নবী মোল্লা বুরুশের মতো কাঁচাপাকা চুল মাথায় কিস্তিটুপিটা দু'হাতে সাটিয়ে দিয়ে বলল, 'আমারে জানে মাইরোনা ইয়াকুব ভাই—আৎকা তুফান আইয়া গেলে ডিঙিটা ওলটাইয়া যাইবো গা আর তহন আমরা'—

'বেহেশতে যাইতে পারবানা। হেঃ হেঃ হেঃ, দোজখেই যাইবা'—

'দোজখে যাইয়াম ক্যান্, এ্যাঁ? পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি, আমি কি গুনাহ করছি?'

'নাহ্, গুনাহ্ কিছ্ছু কর নাই, খালি নেহি কামাইছ।' এ সময় দমকা ঠাণ্ডা হাওয়ার বাড়ি খেয়ে কালোপাথরের মতো গতরটা হঠাৎ আগাগোড়া শিরশির করে উঠল. একহাতে বৈঠা চেপে ধরে অন্যহাতে তুলে নেয় ভারী ময়লা গেলাফটা, তা গায়ে জড়িয়ে বলল, 'সংগ্রামের সময় ক্যাম্পে কি রহম মুরগি সাপ্লাই দিতা ভুইলা গ্যাছগা? কিমুন ডাক্রা ডাক্রা নরম-নরম মাংসের'--

'মিছাকথা সব মিছাকথা।' ছোটখাটো, ঘাড়মোটা পিটা মানুষটা হঠাৎ একটা দম খেয়ে স্প্রিংয়ের মত উঠে দাঁড়াল, বলতে লাগল, 'হুনছ মিঞারা হুনছ ইয়াকুব ভাই আমারে কিরহম খুডা দিতাছে, হুনছ তোমরা সব মিছাকথা, আমি না থাকলে এই সারা এলাহা পাক্তাইব্যারা জালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার কইরা ছাড়ত। তোমরা তো জান আমারে একবার মুক্তির ইস্পাই কইয়া গুলি করতে গেছিল'—

কেরায়া নাওয়ের ছইয়ের ভিতরে ও বাইরে কালোকালো মাথা, কার কোন্ মুখ বোঝা না। ওরা চুপ মেরে আছে।

একটু কি ইয়াকুবই বলা বলল, 'হে, আমি হেই কতাই তো কইতাছি। তুমি মুরগি সাপ্লাই না দিলে আমরা বাঁচতে পারতাম না!'

কল্কল্ ঢেউয়ে ঢেউয়ে নবী মোল্লা তীব্র তিক্তস্বরে বলল, এই দেশ বইলাদের দেশ। নাইলে আমারে পুরস্কার দিত!'

হেলতে দুলতে ডিঙিটা একটা মোচড় খেয়ে ব্রহ্মপুত্রের মোহনার স্রোতে এসে পড়ল। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যখন শুকনো মৌসুম, তখন বেশ ছোটো হয়ে আসে, যদিও গুদারা ছাড়া পার হওয়া যায় না, কিন্তু এখন এইখেই একাকার। ওদিকে পশ্চবটিতে শ্মশানঘাটার উঁচু দেয়ালে আঘাত খেয়ে কল্লোলি জলরাশি, এবং এদিকে পরিত্যক্ত রাইসমিলের পাকায় অনবরত ছপছপ শব্দ করছে। আকাশটা ঘোর হয়ে এসেছে বেজায়, কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামবে সন্দেহ নেই; সঙ্গে কিছু ঝড়তুফানও হতে পারে। কিন্তু কি আর করবে, ঘরের ভিতরে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলে চলে না, দিনের রোজগারে দিন চালায়। সেজন্য দিনের শেষে, রাতের বেলায় শেষ খ্যাপটির

জন্য উদগ্রীব, সহজে ছেড়ে দেয় না। এই একটি খ্যাপেই মেলে কুড়ি পঁচিশ টাকা। ছোট কারবারীরা ঘরে ফেরে, ঘরে ফেরে বিভিন্ন গদীর লোকজন। মাথাপিছু আটআনা ভাড়া ছাড়াও, মাল সওদার বোঝার জন্য পায় অতিরিক্ত। যেমন প্রতিটি পুরা বস্তা দুই টাকা। আসলে শেষ খ্যাপের পয়সা দিয়েই পরদিনের সংসার খরচটা চলে।

বয়সটা এখন পঞ্চাশ-ষাটের মাঝামাঝি, এই যা মুশকিল। এক টানা খাটতে পারে না, হাঁফিয়ে ওঠে। আরেক উৎপাত, বর্ষা আসার সময় থেকে জ্বরে ভুগছে। মাঝে-মাঝে দু চারদিন পড়েও থাকে, তখন দুর্গতির শেষ। পাড়া-পড়শিরা যে এক পোঁয়া চাল দিয়ে সাহায্য করবে তাও হয় না; এমনি বদলে গেছে মানুষের মন। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত: যত পায় তত চায়।

আসলে নসিবটাই মন্দ ইয়াকুব মাঝির নইলে এমন জোয়ান পোলাটা অকালে মরবে কেন! মুক্তির দলে যোগ দিয়েছিল, গোলাবারুদের বোঝা বইত, আশুগঞ্জের যুদ্ধে গুলি খেয়েছিল ইব্রাহিম: সে একাত্তরের তেসরা এপ্রিল। স্মৃতির পাতায় অনেক ছবি, ওই পঞ্চাশ বছর ধরে জমা হয়েছে যাদের কিছু কিছু ঝাপসাও কিন্তু এই ছবিটা সবচেয়ে উজ্জ্বল। আগে থেকে আন্দাজ ছিল দুপুর এগারোটার দিকে গ্রামের গাছপালা কাঁপিয়ে সাঁ সাঁ করে ক্ষিপ্রবেগে উড়ে এল তিনটে জঙ্গীবিমান। মেঘনাব্রীজের চৌহদ্দি জুড়ে খ্যাপাচিলের মতো ছোঁ মারতে লাগল। আর ফট্ ফট্ ফট্ কি আওয়াজ! এই গৌরীপুর গ্রামের পুবপাড়া থেকে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে দেখছিল ছেলেবুড়ো অগণতি নারী-পুরুষ, কিন্তু এখান থেকে বুঝতে পারেনি যে এরা অনবরত গুলিবৃষ্টি করে যাচ্ছে, গুদাম ঘরগুলোর টিনের চাল ঝাঁঝরা। গাঙের উপরে বেশ কিছু নৌকা, ছোট ডিঙি, বড় কোষা; শেষে বোঝা গিয়েছিল আসল লক্ষ্য এগুলোই, যার মধ্য থেকে দেশী বন্দুক তাক করে লড়াই করছিল জোয়ান কর্মীরা, ওহ কি বোকামী! মেশিনগান স্টেনগান রাইফেলের সঙ্গে পাল্লায় এগুলো তো বাঁশের লাঠিও নয়। কিছুক্ষণে কারবার শেষ। অনেক ডিঙি উল্টে গেলো, কিছু কিছু পিছু হটতে চেষ্টা করল। গুলিবৃষ্টির নিচে কতজন যে প্রাণ দিল তার হিশেব কেউ জানে না। কয়েকজন রণেভঙ্গ দিয়ে সাঁতরে এসেছিল এপার। আশুগঞ্জ দখল হয়ে গেলে অনেকেই ওদিকে যাওয়ার সাহস পেত না। অবশ্য কিছু লাশ পাওয়া গিয়েছিল এদিক-ওদিক, বিশেষত চরাঞ্চলে; কিন্তু সম্ভবত অধিকাংশ

ভেসে গেছে মেঘনার ভাটির স্রোতে। শুনেছে, পঁচিশের রাতের ইকবাল হল ও রোকেয়া হলের ছাত্র-ছাত্রীদের মতো এরাও স্বাধীনতার প্রথম বলি, প্রথম মুক্তিযোদ্ধা।

এদিক থেকে, যখন একটু তলিয়ে দেখে, বুঝতে পারে, ইবার লাশ যে পাওয়া যায়নি, এটা ভালোই হয়েছে। ইবার মা আমিরন এখনো, এই একযুগ পরেও তাঁর ছেলে ফিরে আসবে—আসলে সে আগরতলা হয়ে আসাম চলে গিয়েছিল। নতুন ধান উঠলে পিঠা বানায়, থরে-থরে সাজিয়ে রাখে সিকের পাইলায়।

'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ' এখন মনের কোণে একটু ভেসে উঠতেই ইয়াকুব নড়েচড়ে বসল, বিড়বিড় উচ্চারণ করে, আমি বিশ্বাস করি না। ইবা-খতম। আমিরন ভাবতাছে, আছে। বেশ ভাবুক, শান্তি পাক্।

যে গেছে, সে চলে গেছে চিরতরে, তার জন্য হায় আফসোস নিরর্থক। স্মৃতিটুকু, আস্তে আস্তে তা'ও ম্লান হয়ে যাবে, পরে শ্যাওলাপড়া ঝিনুকের মতো কাদার তলে নিশ্চল।

কিন্তু, কিন্তু যে বেঁচে আছে তার জন্যই যত চিন্তা। দুর্ভাবনা, এমনকি দুঃস্বপ্ন। হ্যাঁ বেঁচে আছে জয়নাব এবং এখন ওর জোয়ানকী বয়স। আঠারোতে পড়েছে। জোয়ানকালের আমিরনের মতো, না না জোয়ানকালের আমিরনের চাইতেও খুবসুরথ হয়েছে, বর্ষাকালের এই গাঙের মতো ভরপুর।

এর মধ্যে গভীর রাতে তিন-তিনবার বাড়ির পিছনে গুন্ডা-নৌকার ছপ্ ছপ্ আওয়াজ শুনেছে।

'না, না, আর না। জলদি-জলদি জয়নাবিরে পার করন দরহার, —বিয়াশাদি অইয়া গেলে পরে যা অওয়ার অউক। বাদবাকী কপাল। হ্যাঁ, কপাল। কপাল।'

'জয়নাব, জয়নাব!' ও নিয়মমাফিক সোওয়ারীদের মসজিদঘাটে নামিয়ে দিল, তারপর বুকপানি লুছের দিকে বাঁক নিয়ে ছইর বেয়ে নিজেদের বাড়ির আমগাছতলায় ডিঙিটা থামাতে-থামাতে আবার ডাকে আরেকটু উঁচুস্বরে, 'জয়নাব গো! মা তুই গেলে জলদি বারই আইয়া আয়'—

আমগাছের গুঁড়িতে আধ হাতের কিছু বেশি পানি উঠেছে, সেখান থেকে উত্তর দক্ষিণে গ্রামের বড় রাস্তাটা চলে গেছে, তা আরো উঁচু। বড় বর্ষাও একে ডোবাতে পারে না। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং এ গ্রামের কৃতিসন্তান মোগল মিঞা প্রেসিডেন্টের কীর্তি—

তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে চাপ দিয়ে করিয়েছিলেন। গ্রামের শেষ প্রান্ত মেঘনা ব্রিজ নির্মাণকালীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলোনী থাকার সময়েও এতটা প্রশস্ত ছিলো না এখন তো সেখানেই একটা জুটমিল হয়ে গেছে। দিনরাত সরগরম। অনেকে চোরা লাইনে ইলেকট্রিক বাতিও জ্বালছে। ওপারে ফার্টীলাইজার ফ্যাক্টরী, আর এই গ্রাম এখন আধা শহর। বড় রাস্তার ধারেই তার পৈতৃক ভিটেমাটি, তিন কাঠা জমি: পিছনদিকে বাঁশঝাড় আছে। পশ্চিমের ভিটিতে আদিকালের বড় ছনের ঘরখানা এবং পূব ভিটেতে একটি ছোট টিনের দু'চালা। বারো বছর আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। তরজার-বেড়া অনেক জায়গায় ভেঙে পরেছে, কে করবে মেরামত? ইব্রাহিম তুলেছিল, মধু ফড়িয়ার সঙ্গে এক সিজন পাট সংগ্রহের কমিশনের টাকায়। ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে আড্ডা দিত এবং রাতে ঘুমাত। জলদি একটা বিয়ে শাদি করারও কল্পনা ছিল।

একটা মাঝারি পাতির মধ্যে কিছু বাজার সওদা: কলাপাতার পুটলিতে ছোট মাছ সোয়াসের চাল আধপোয়া ডাল এবং এক শিশি সরষের তৈল।

ইয়াকুব পাতিটা টেনে এনে রাখে গলুইয়ের কাছে, তারপর ছই-য়ের কোণ থেকে সলতেটা উসকে দিয়ে হারিকেন আনল। গাছ-গাছড়ার মধ্যে তার বাড়ির ঘর দুটো আবছা-আবছা আঁধারে ঘাপটি মেরে আছে, জনপ্রাণী আছে বলে মনে হচ্ছে না; কিন্তু দু'বাড়ি পরই সুরুজ মিঞার বাড়ি, সেখানে ঝলমলে বিজলির আলো দেখা যাচ্ছে। আমিরন যদি ঘরে থাকত, তবু কুপি জ্বলত। কোমরের কাছে ঠেকিয়ে পাতির ধারটা মুঠো করে ধরল, ডান হাতে হারি-কেনের কাড়া। এক লাফে নৌকো থেকে নেমে লম্বা পায়ে এগুতে থাকে, এইতো এখানেই পূবভিটির দু'চালা ঘর। দরোজা খোলাই ছিল, হারিকেনটা একটু উঁচিয়ে ভিতরে দেখল, না রুহুমত আসেনি।

ইঁদুর মাটি উপরে রেখেছে। ইব্রাহিমের শক্ত কাঠের চৌকিটাতে এখন শোয় লালপুরের জ্যেঠাসের ছোট ছেলে রুহুমত, শোকাত আমিরনের অবদারেই সে এসেছিল। অনেক চেষ্টা তদবিরের ফলে কোহিনুর পাটকলে তার কাজ প্রায় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে সম-য়েই মেম্বর তাকে দ্বিগুণ বেতনে নিয়ে নিল। মিলের থেকে অদূরে

পশ্চিমের চকে তার নতুন কেনা সাতবিঘা পাট জমি। রুহুমত পাট চাষ করে। বছরমুণি হিশেবে এখন তার দ্বিতীয় বছর চলছে। বিবিসাহেবের তো আমিরনকে ছাড়া চলেই না, তার সঙ্গে জয়নাব-কেও টেনে নিয়েছে।

না, না ভালো লাগে না, লক্ষণ খুব খারাপ। পশ্চিমের ঘরে ঢুকে জিনিশপত্রের পাতিটা বেড়ার কাছে রাখল, হারিকেনটা মেঝের উপর। তরজার বেড়ার কাছে ঠুনির সঙ্গে লাগানো ভাবাটা তুলে এনে কলকেতে তামাক ভরল। চাবিতে চাপ দিয়ে হারিকেনের চিম-নীর তলা উঠিয়ে টিকে ধারায়, তারপর গুড়গুড় করে টানা থাকে বেহুসের মতো।

যে জানোয়ারটাকে খোয়াবে দেখে অথচ চিনতে পারে না, যাকে ধাওয়া করে উন্মত্তের মতো, তার পাশে কেন তার মনে জাগে সুরুজের মুখ, ইয়াকুব মাঝি বুঝতে পারে না। সে ছটফট করে, এবং শুধু কষ্ট পায়। বয়স আর কত হবে, চল্লিশের কাছাকাছি। জন্মাতে দেখেছে আতুরঘরে, উঁয়া উঁয়া কান্নাও শুনেছে। এখন যেখানে বাড়িটা বানিয়েছে সেখানে ছিল আরো চারজন গরীব-গোবরার কুঁড়েঘর। তার দশহাত পৈত্রিক ভিটার লাগালাগী। ভৈরব বাজারের গদীগুদামে ওরা মুটে-মজুরের কাজ করত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও, পেটের ফিকির করতে না পেরে সংগ্রামের পরে সব বিক্রি করে ওরা দল বেঁধে বাল্লা চলে গেছে, মাটি অল্প পয়সায় কেনা যায়, বন্ধক পাওয়া যায় ওখানে, ঝোপঝার জলাজঙ্গল। কেউ কেউ আগেও গিয়েছে, যারা এখন ভালো গেরস্ত। ঝাড়জংলা কেটে জমি বানিয়ে বসবাস করছে। ওদের অংশ কিনে আস্তে-আস্তে ভিটেপাতা বড়-বড় টিনের ঘর, তারপর পশ্চিম ভিটিতে বড়-পাকা দালান তৈরি করেছে, তাই এখন এলাকা জুড়ে প্রশংসার পাত্র। বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্মানিত ব্যক্তি। চেয়ারম্যান হতে দেরি নেই, আবার ইলেকশন হলে, শোনা যায়, ভোটেও দাঁড়াবে নির্ঘাত। ওর বাপ ছিল কাছারীর পেয়াদা, সব সময় হম্বিতম্বি করত, লোকজন পেটাত; অথচ সে যেন বিপরীত। নাক উঁচু তামাটে চেহারা, কিন্তু খুব ধীরস্থির। সংগ্রামের আগেও ছিল ভৈরবে মুক্তি বিড়ি কার-খানায় বিড়ির কারিগর, সংগ্রামের পর নিজেই কারখানা চালু করে; অবশ্য তখন মালগুদাম যারা লুঠ করছে তাদের মধ্যে দেখা যায়নি, কিন্তু ব্যাংক লুঠের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে কেউ-কেউ সন্দেহ করে। তবে একবার বড়লোক হয়ে গেলে তার পূর্ব-ইতিহাস কেউ আর

ভাবতে চায় না; আবর্জনা ঘেটে কি আর লাভ, দুর্গন্ধই তো বেরুবে শুধু! এখন ঢাকায় মগবাজারে আলিশান বাড়ি বানাচ্ছে। ফি হপ্তায় দু'তিনবার যাওয়া-আসা করে। চাচা-চাচা করে সব সময়, যথেষ্ট তমিজ দেখায়, যদিও কেরায়া নাওয়ের মাঝি, আর গোটা পরিবার তো বলতে গেলে তার আশ্রয়েই আছে। তবু একটা প্রচন্ড, অদ্ভুত ঘৃণা তার প্রতি; মাঝে-মাঝে যখন তারই নৌকায় বসে সিগারেট টানে আর হাসে, ফুসে ওঠে; ইচ্ছে হয় এক্ষুণি ছুটে যায়, বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে তার উপর এবং প্রবলভাবে দুই হাতে গলা টিপে ধরে তাকে হত্যা করে। আজকাল রাতবিয়েতে ডাকে তারে, নৌকা নিয়ে চলে যায় এদিক-ওদিকে চেনা-অচেনা বহুজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে—তাতে করে বিতৃষ্ণাটা আরো বেড়েছে।

যে কোনো কুকুর যেমন অনেক দূর থেকে অচেনা লোকের গন্ধ পায়, ইয়াকুব মাঝিরও মনে হয়, জয়নাবের উপরে সুরুজের নজর আছে। ভীষণ নজর। খাতির যে করে এই তার প্রধান কারণ। আজকাল আমিরনটার যে কি হয়েছে, কিছু দেখেও না। আরো এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হুকোটা রেখে দিল মট্ করে এবং হারিকেনটা টেনে নিয়ে ঘরে থেকে বেরিয়ে আসে। জ্বর একটু বেড়েছে। বুকের ভিতরটা যেন ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে, ওদিকে তাকিয়ে তীব্রস্বরে আবার ডাক দিল,—'জয়নাব—!'

২

এইটে ভিতর বাড়ি, যেখানে পূব-পশ্চিম ইটের দেয়ালের মাঝামাঝি কাঠের দরোজা।

শিরশির করে কাঁপছিলো গতরটা, ময়লা ভারী গেলাপ একটা ভালো মতো জড়িয়ে নেওয়া সত্ত্বেও মাঝে-মাঝে দাঁতে-দাঁতে কাঁপুনির মৃদু শব্দ। হারিকেনটা ঝুলিয়ে ধরেছে, থপ্ থপ্ পায়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরের উঠোনে যাওয়ার সময় জানালায় চোখে পরে, পালঙ্কের উপরে বালিশ আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পরীবানু কাতরাচ্ছে আর তার কোমরটায় জোরে-জোরে চাপ দিচ্ছে জয়নাব। মুখের উপরে, ঘাড়ে, পিঠে, গোছা-গোছা খোলা কালো চুল।

অদূরে ইজিচেয়ারে কাত হয়ে ফরসি হুকোর নল টানছে সুরুজ মিঞা, ডান পা'টা সামনে একটা জলচৌকির উপরে রেখেছে। এদিকে একটা ছোট টেবিল ও গোটা চারেক চেয়ার। বোঝা যায়, একটু আগে রাতের খাওয়া শেষ করেছে।

চুপচাপ তামাক টানছিল, আর যতরাজ্যির ভাবনা যেন ভাবছিল, কিন্তু বোঝা যায় একটি জিনিশের প্রতিই তার আসল মনোযোগ! সে আর কিছু নয়, জয়নাব। একেবারে পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে দেখছে আর সামনে কেমন একটা গভীর আমেজের সঙ্গে মুখ ভরে-ভরে সোঁদালো ধোঁয়া দিচ্ছে ছড়িয়ে। উৎকৃষ্ট খাম্বিরা তামাকে একটা নেশা-নেশা ভাব, মগজের ভিতরটা ঝিম্-ঝিম্ করতে থাকে মাদকতায়। একান্ত তন্ময়ভাবে দেখতে-দেখতে ভিতরে যেন উত্তেজনা অনুভব করে, কিন্তু তবু শান্ত একবার মুখ থেকে নলটা তুলে ডাক দিল, 'ও জয়নাব, একটা পান খাওয়া তো—আমার আবার বাইর অইতে অইব।'

কোমরে মালিশ করতে-করতে ভীরু চোখে তাকায় একবার জয়নাব। তারপর চোখ নামিয়ে ফেলে।

কথা শুনতে-শুনতে রান্না ঘর থেকে এদিকে আসছিল আমিরন গরম পানির কেটলি নিতে, মেয়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর বাজারে না গেলে আয়না ব্যাডা? দিন খারাপ, চারিদিকে দইরার পানি'—

আপন বিবির সহানুভূতি দুর্লভ জিনিশ. কালেভদ্রে যে একটু-আধটু প্রকাশ পায় সে বেখেয়াল থাকার সময়; সেজন্য আমিরনের কথা শুনে খল্ খল্ করে হাসতে থাকে সুরুজ মিঞা, হুকোর নলে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'অত ভাবলে চলে না গো। আল্লা-হুর রহমতে আর তোমাদের দোয়ায় অহন আমার কত বড় ব্যবসা, শহরে-বন্দরে আড়তে-আড়তে ছড়াইয়া গ্যাছে গা। কিন্তু মানুষ কই? তাই একলা আমারেই সবদিকে নজর রাখতে অয়। জানতো এবার কমলাগাড়ে একটা বড় গুদাম তিন বছরের বন্ধক নিছি, এই মওসুমে পাটের কারবারেও নামতাছি। ওহ্ হো, রুছমইত্যা অহনো ফিরে নাই? ফিরবো ক্যান, রক্ত গরম তো। মনের মইধ্যেও তুমতুমী। বোধহয় কালক, ছুড়ি লইব!' শেষ কথাটার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিজে ছাড়া কেউ বোঝে না। জয়নাব মুখ তুলে একটু তাকায় মাত্র।

পালঙ্কের কাছেই মাইফল, তার উপরে চকচকে রুপালি পানের বাটাটা ছিল। আঙুলে চাপ দিয়ে ডালা খোলে। সুপারির খোপ খালি, ছুরতাটা টেনে নিয়ে সুপারি কাটে জয়নাব কট্‌রকট্‌র।

বাঁকাত থেকে ঘুরে পরীবানু প্রথমে চিৎ হয়ে শোয়, তারপরে আবার ডানকাত হয়ে বলে, 'কত মানা করি, রাইত করিছ না। সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় ফিইরা আইস্। একদম কথা শোনে না। সাতদিনে সাতকানি জমির পাট কাটা সম্ভব? কে জানি পাম্প দিছে, হেতেই হে বাহাদুর। না কোনো বাঁজি রাখছে কিচ্ছু তো কয়না। গলা পানিতে আইট্যা-আইট্যা অত রাইতে নাইল্যার পেতি লইয়া কি কেউ গাড়ে আইয়ে? কোনোদিন হাপে না কামড়ায়—এইড্যাই আসল ডর।'

সাপের কামড়ের কথা শোনা মাত্র জয়নাবের হাতের আঙুলে ছুরতাটা থেমে যায়, সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল তাকায় পরীবানুর মুখের দিকে, সুরুজ মিঞা তখনো দেখছিল, তাড়াতাড়ি বলল, 'আরে তোর বুবাইর কথায় ভাবিস্‌না। অত পানিতে হাপ থাহেনা; বর্ষার সময় তারা উইঠ্যা যায় শুকনা জঙ্গলে ডাঙায়।'

জয়নাব পানের খিলি তৈরি করে কাছে গেলে সুরুজ মিঞার দিকে তাকিয়ে আবার খল্‌খল্‌ করে হাসে। পিতলের পানদান থেকে পানের একটা খিলি তুলতে-তুলতে বলল, 'তোর বুবাইর শরীলডা একটু বেশি খারাপ লাগতাছে আজগা, আর আমিও গদিৎ যাইতাছি। ফিরি না ফিরি, কইতাম পারতাছিনা। তুই আজগা থাহিস্‌।' জয়নাব একটু তাকাল আবার, তারপর এদিকে চলে আসে পানদানিটা হাতে নিয়ে।

এ সময় জানালার কাছ থেকে সরে এসে ইয়াকুব বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল, তার চোখজোড়া নিমেষে যেন আরো গর্তে ডেবে গেছে; মুখ ভরতি কাঁচাপাকা দাঁড়ি। মোচ ও মাথার ঝাঁকড়া চুলে সে বন মানুষের মতো। একবার ঢোক গিলে ডাক দেয়, 'জয়নাব গো!'

'ও বাজান আইছে'—বলে জয়নব এক মুহূর্তে এদিকে আসে, কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'বাজান আইছ

'অয়ো ইয়াকুবের যেন কান্নাকান্নাভাব এবং জ্বরের শির শির কাঁপুনিটাও লুকোতে পারছে না; এক পা এগিয়ে বলল, 'তোরা হগলতে গাড়ি ছাইড়া আইয়া পড়ছস। আমি কি করুম, জ্বরটা বাড়তাসে।'

জয়নাব এক দৌড়ে নিচে নেমে বাপের হাত ধরে দেখতে থাকে, 'ইস্‌ ঠিকই তো, গতরটা পুইড়া যাইতাছে'—

এসময় পান চিবাতে-চিবাতে একটু এগিয়ে আসে সুরুজ মিঞা। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইদিকে আও চাচা মিঞা, আমি তোমার কথাই ভাবতাছিলাম।'

'কিন্তুক চাচা! আমি তো আজগা আর বাজারে যাইতে পারুম না।' এবং সত্যি সত্যি কাঁপছে, আরো কয়েক পা এগিয়ে তাকায় সুরুজের দিকে।

'বাজানের জ্বরটা বাড়ছে।' জয়নাব বলল। তারপর বাপের হাত ধরে তাকে বারান্দায় তুলে একটা জলচৌকি দিল বসতে।

'আমার একটা কতা মনে পড়ছে সুরুজ মিঞা!' প্রায় হাঁপাচ্ছে, একটু থেমে ইয়াকুব বলল, 'যাইতে যহন আইবো রুছমত তোমারে দিয়া আইতে পারে। আমার লগে তো হে অনেকদিন নাও বাইছে। অর বুকভরা সাওস—তুফানের মইধ্যেও ফিইয়া আইতে পারবো'—

টিনচাল রান্না ঘরটা একটা দ্বীপের মতো দক্ষিণের ভিটিতে। দালানের সঙ্গে সাঁকোর মতো সংযোগ রয়েছে, বৃষ্টি বাদলায় যাওয়া-আসার জন্য যার উপরে ছাউনি। কথাবার্তা ও কণ্ঠস্বর কানে বাজলে খরচুন হাতে আবার আসে আমিরন, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে স্বামীর অবস্থাটা

আঁচ করে বলল, 'আমি কইছিলাম যাইয়ো না। আমার কথা আর হুনল কই—জ্বর পড়ছে, খুব ভালা অইছে'—

'আহ্‌হা, রাগ কইরো না জয়নাবের মা', সুরুজ মিঞা দরদের সঙ্গে বলল, 'আমি কই কি, আমার ঢাকার বাড়িডার চুণকাম অইতাছে তো? এই আর কয়েকটা দিন, ফয়সলের মায়েরে লইয়া যাইতাছি পিজিতে ভরতি করনের লাইগ্যা, তখন চাচামিঞা যদি যায় ভালো। মেডিক্যালে একটা সিট জোগাড় কইরা দিমামনে। সরহারী ব্যবস্থা, ট্যাহাপইসা লাগবো না; ওষুধ পইথ্য না—হয় আমিই দিলাম'—

'লাগবো না লাগবো না মিঞা, আমার এসব লাগবো না', প্রবল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বলল ইয়াকুব, 'গোরের পারে খাড়ইয়া রইছি'—

'খাজুইরা কথা বাদ দেও চাচা, তুমি মরলে কার কি অইব—এই মাইয়াডা আর চাচিরই [illegible] কষ্ট অইব।' একটু ক্ষোভাবেই [illegible] করলো সুরুজ, তারপর বলল, 'আসলে ডাক্তার যাই কউক, তোমার জ্বরটা চাচা টাইফয়েড। [illegible] মারাত্মক ছিল, আইজকাইল কিছু না। চিকিৎসায় ভালা অইয়া [illegible] হ, আমি আর তোমার কথা হুনমু না, তোমারে বাইন্ধা নিয়া যাইমু। দেহি তুমি কি কর—হে-হে হেহে ওই [illegible] আই [illegible] নে হয়, আওয়াজ হুনতাছি

ওরা কিছুক্ষণ কানখাড়া করে রাখে এবং আসলে অপেক্ষাই করে রুহুমতের জন্য; কিন্তু জলদি আসছে না দেখে বারান্দা থেকে নেমে চলতে লাগল। আমিরন কোমর-বরাবর আগলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সামনে হারিকেন—হাতে জয়নাব। পিছন থেকে সুরুজ বলালো, 'জয়নাবরে পাডাইয়া দিও জলদি, বিবিসাব একলা আছে।'

কেউ ওরা কোনো জবাব দিল না। যখন-তখন এবাড়িতে কাজ করতে এলেও ইয়াকুব মাঝির কাছে থাকলে ওর কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যায়, এবং যেন বুঝতে পারে না। ইয়াকুব মাঝির কালো পেশল দেহে যেন একটা অদ্ভুত বুনো শক্তি আছে যা অন্যের গায়েও সঞ্চারিত হয়ে যায়, কাছে এলে, বিশেষ করে [illegible] স্বজন

এই মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত পরিচিত ও পুরাতন, তবে বাঘভালুক সে জোয়ানই হোক কি বুড়ো, তাদেরকে হাতের তালুতে তুলে নাচাবার ক্ষমতা সুরুজ আয়ত্ত করেছে। একটু বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে তার মোচের নিচে, ওরা গেট পেরিয়ে গেলে সিল্কের লুঙ্গিটা হাঁটুর কাছে মুঠো করে ধরে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে আসে, যখন পরীবানু পালঙ্কের সিংহাসনে বালিশ উঁচু করে উঠে বসবার চেষ্টা করছিলো। তাকে একলা

দেখামাত্র সম্পূর্ণ অন্যরূপ হয়ে গেল বলে, রোগের কাতরতা নেই বিন্দুমাত্র, চেহারাটা নিমেষে কঠোর ও স্থির, সুরুজ কাঁধে ধরে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলে চাপা রুক্ষস্বরে বলল, 'খবরদার ! আমারে ছুইবানা'—

একটু থেমে দমে যায় সুরুজ, নিমেষে মুখটা কালো; কিন্তু মনে-মনে শক্তি সঞ্চয় করে বলল, 'আমি কি করছি যে সব সময় ইমুন দূর-দূর কর ?'

'কি করছ তার ফিরিস্তি দিতে অইবো, না ? তুমি কি মনে কর আমি কিছু জানিনা, কিছু বুঝিনা রাগ যেন শক্তির উৎস, সব রকম নির্জীবতা ঝেড়ে ফেলে এবং শরীরটাকে তির্যক করে তোলে। নিজেই নামল পরীবানু পালঙ্কের উপর থেকে, কাঠের কার্ণিশে টাল সামলে নিচে ফেলে রাখা স্পঞ্জের স্যান্ডেলে পা ঢোকাল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। স্বামী উপলক্ষ্য মাত্র, যেন নিজের কাছেই নিজে বলতে থাকে, 'আমি ঠিকই আছি। যে কোন মাগি দেখলেই যহন কুত্তার লাহান জিবরাৎ পানি লালা ঝরে তহন দুই একটারে কলমা পরাইয়া লইয়া আইলেই অয়, আমি তো মানা করতাছি না। আমার কপালে যা আছে, তা অইব। অত ভাইব্যা লাভ কি, জীবন তো একটাই'—

এতক্ষণে সুরুজের প্রায় কাঁদো-কাঁদো ভাব, কাতরস্বরে বললো, 'তুমি আমারে খালি সন্দ কর পরী, আমি কি করুম ! এক বিছানায় থাকতে দ্যাওনা, আমি তো একটা পুরুষ ? ক'দিন আর এইভাবে কাটাইয়াম'—

'এই জিন্দেগীতে তুমি আর আমার লগে থাকতে পারবা না, আমি কইয়া দিলাম। তুমি যা ইচ্ছা তা কর, আমি অনুমতি দিলাম।' একটা ঢোক গিলে পরীবানু বলল, 'আজগ্যা বাড়িৎ ফিইরোনা। পাড়াৎ গিয়া কোনো বেশ্যা মাগির লগে হুইত্যা থাইক্যো।'

হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে যায়, দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে চোখজোড়া, সুরুজ একটা দাঁত খিচুনি দিয়ে বলল, 'বেশ বেশ। সব সময় যখন এক কথাই কও, আমার যা মনে লয় তাই করুম্‌। আমি ঘরবাড়ি সয়-সম্পত্তি কিছুই চাই না, কিছুই চাই না। আমি সব জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার কইরা দিয়াম'—

শেষ দিকের কথাগুলো চাপা চিৎকারে বলতে-বলতে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল, কিন্তু কিছুক্ষণ থামল মাত্র; কি ভেবে বারান্দা থেকে উঠোনে নামে, তারপর উঠোন থেকে পূব ভিটের চৌচালা টিনের ঘরের পাশ দিয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে গাছতলায় বর্ষার ছল্‌ছল্‌

পানির কাছে চলে গেল। পালঙ্কের কাছে পরীবানু দাঁড়িয়ে নিস্পন্দ নির্বাক। একটু পর একটা তীব্র ডাক শুনতে পেল, 'রুছম—ত!'

আসমানজোড়া টইটম্বুর জলেভরা মেঘ ধীরগতিতে ঝরছে, তার আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেছে খুন্ড চাঁদ। গাছতলায় খুঁটিতে বাঁধা ছিলো ইয়াকুব মাঝির ডিঙি, তাতে চড়ে ব্রহ্মপুত্রের মোহনা ছাড়িয়ে মেঘনায় গিয়ে পড়লে সুরুজ মিঞার বুকের ভিতরটা ছপ্‌ছপ্‌ ঢেউয়ের মতোই আলোড়িত হতে থাকে, সেখানে অনেক ক্ষোভ আর অভিমান।

কি বিচিত্র সব জীবন! যখন উপোস কিংবা আধপেটা খেয়ে থাকত, তখোন সুখ ছিল, এখন ধনসম্পত্তি যত বাড়ছে শান্তি চলে যাচ্ছে। আল্লহ্‌র মাল একটাই, আবু ফয়সল। প্রথমপুত্র, এবং প্রথম সন্তান, আর এখন দেখা যাচ্ছে, একমাত্র সন্তান। এরপর চার-চারটে বাচ্চা পড়ে গেছে; পরীবানুর গর্ভস্থলির অসুখ আর ভালো হবার নয়। তাতেও তো কোনোদিন বিরক্তি প্রকাশ করেনি, বরং বারে-বারে সান্ত্বনা দিয়েছে। কিন্তু কি অদ্ভুত, পরীর ধারণা তার সন্তান ধারণক্ষমতালোপের জন্য স্বামীই দায়ী, ভিতরে সিফিলিস ঢুকিয়ে দিয়ে সে তার সর্বনাশ করেছে।

নৌকা বাতাসের ভাটিতে কমলাঘাট এসে পৌঁছুলে গুটানো ছাতাটা হাতের মুঠোতে ক'রে নেমে পড়ল। একটা পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাদিকি, নাইল্যা কাটছসা পেতি। আনছস্‌—রুছমত তোরা যাইগ্যা। আমি যদি নাও পাই, তাইলে বাড়িত যাইয়াম, নাইলে গদিতেই থাহুম'—

নৌকার পাছায় বৈঠা থামিয়ে বসেছিলে, রুছমত, জবাব দিল, 'আপনে কইলে থাকতে পারতাম।'

'না, না লাগবনা।' সুরুজ বলল, 'তোর মামীর অসুখটা বাড়ছে, তাছাড়া তোর খালুরও খুব জ্বর। তাড়াতাড়ি যাইগ্যা, একটু খেয়াল রাহিস্‌—ওহ্‌হো, কুড়ি ট্যাহা নে, জয়নাবের মায়েরে দিস্‌। সাগুবালি চিনিমিশ্রি যদি কিনুন লাগে'—

একটু সামনে ছইয়ের কাছে এসে হাত বাড়িয়ে পাঁচটাকার চারটে নোট নিয়ে এসে বৈঠা তুলে একঠ্যালায় নৌকা ছেড়ে দিল। জুগালি ক্ষেতমজুর বালক কোরবান তিনদিন ধরে সঙ্গে-সঙ্গে আছে, সে ছইর বাইছিল। বিপরীত হাওয়ায় হালকা ঢেউয়ের উপর দিয়ে ছপ্‌ছপ্‌ করতে-করতে ওরা ফিরে চলল।

পুরাতন দেওয়াল ঘড়িটাতে ঠং করে আধঘণ্টার সংকেত বাজে, নিজের ছোট গদীর দরোজার একটু ভিতরে উঁকিদিয়ে দেখে এদিকে চলে আসে কেরু মিঞা সওদাগরের দালানের সিঁড়িতে; পায়ে রবারের পাম্প সু, আস্তে-আস্তে প্রায় নিঃশব্দে দোতলায় উঠে কোণের কক্ষে চলে যায়। কপাট ভেজানো ছিল, টোকা দিতেই খুলে গেল।

'ও, আইয়া পরছস ? আয় দোস্ত।' টেবিলের ধারে চেয়ারে বসা নাদুসনুদুস চকচকে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কেরু বলল, 'স্যার, এই আমার বাল্যবন্ধু সুরুজ মিঞা। একেরারে সোনার মানুষ—দুনিয়া উইলটা গেলেও কথার হেরফের করে না।'

ভদ্রলোক একটু হাসলেন, চশমাটা ঠিক করে নিয়ে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতে-করতে বললেন, 'পরিচয় হওয়ায় খুশি হলাম। আপনার অনেক নাম শুনেছি, ভালো আছেন তো ?'

'জি হ্যাঁ, আপনার দোয়া।' অমায়িক ভাবে সুরুজ বলল, 'আমার দোস্ত কেরু মিঞা তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলে, আপনে যহন আমরার কেসটা দয়া কইরা নিছেন, আর কোন চিন্তা নাই। আমরা জানি, আপনার লাইন সবথিকা শক্ত'—

'না, না, কি যে বলেন।' ভদ্রলোক দুই ঠোঁটে একটা সিগারেটের ফিল্টার চেপে ধরে দেশলাই বার করলেন, 'আপনারা হলেন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি। যে যে ভাবেই আসুক, শাসন করুক, আসল শাসনকর্তা কিন্তু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সমাজ, আপনাদের হাতেই সব কলকাঠি। আপনারা যে ভাবে চাইবেন সে ভাবেই চলবে দেশটা, এই হলো আসল কথা। কিছু চিন্তা করবেন না, আপনারা জুট মিল যখন করতেই চান, আমি পার্মিশন এবং লোন দুই-ই আদায় করে দেবো'—

'হুনছত সুরুজ ? আমি কইছিলাম না

'হ, কইছিলা তো ?' সুরুজ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিনিত ভাবে বলল, 'আপনের ঠিকানাডা দিয়া যান স্যার, আমি আগামী হপ্তায় ঢাহাত যাইতাছি। আপনের লগে দ্যাহা করুম'—

'ও শিউর শিউর।' ভদ্রলোক জলদি ব্রিফকেস খুলে একটি ভিজিটিং কার্ড বোর করে সুরুজের হাতে দিলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমি মতিঝিলেই বসি। টেলিফোন করে আসবেন। ও হ্যাঁ, এগারোটা বাজে আশুগঞ্জে আমার একটা ডিল ছিল, কাল ভোরের ট্রেন ধরতে হবে। এখন বিদায় নিতে হয়'—

'এমুনভাবে আইলেন স্যার গরীবের ঘরে, একটু হাতও ভিজাইলেন না। আপনেরা হইলেন হাইবেলাস মানুষ, আপনেদেরকে কি আমরা

যত্ন আত্তি কতে পাইয়াম ? আশুগঞ্জের তাইনে অনুগ্রহ কইরা আপনের লগে পরিচয় করাইয়া দিছেন, নাইলে কি আর আমরা আপনেরে পাই ?' পাঞ্জাবির ডান পকেট থেকে সুতোদিয়ে বাঁধা একবোন্দা নোট বার করে বাড়িয়ে দিল, অতি তমিজ সহকারে বলল, 'এই ন্যান স্যার, গরিব আদমী আমরা কি দিব। আপনের চা-পানির খরচ'—

নোটের তোড়াটা নিয়ে সুটের বুকপকেটে ভরতে-ভরতে জিগগেস করলেন, 'কত ?'

কের্ মিঞা হাতের তালু ঘষতে-ঘষতে বলল, 'আমরা গরিব আদমী, বেশি আর কত দিয়াম, স্যার ? মাত্র দশ হাজার'—

নিমেষে ভদ্রলোকের চেহারাটা কিঞ্চিৎ কঠিন হয়ে গেল। তিনি স্থিরভাবে বললেন, 'খলিল হাজী পাঠিয়েছেন, উনি আমার মুরুব্বী, সুতরাং ফিরিয়ে দিলাম না। কিন্তু মনে রাখবেন। জুটমিলের জন্য প্রতি পারমিটের কমিশন আমার একলক্ষ টাকা'—

আর অল্পক্ষণের মধ্যে ওরা দু'জনে তাকে ঘাটে অপেক্ষমান একটি নৌকায় তুলে দিয়ে ফিরে এলে, সুরুজ সিঙ্গল চৌকিটার বিছানার উপরে গা এলিয়ে দেয়, এবং চোখ বুঁজে থাকে ঘাড়ের নিচে বালিশ গুঁজে। কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন কের্ মিঞা, হাতের পাতায় কপালটা ছুঁয়ে বলল, 'কিরে কি অইছে, অসুখবিসুখ করে নাই তো ?'

'না, না। এমনি একটু বিশ্রাম নিতাছি।' এবার একটু তাকিয়ে বলল, 'ফজরের সময় যে শুরু হয়, আর শেষ অইতে রাইত বারোডা একটা—এত কাজ !'

'হ, তাতো ঠিকই।' একটা সিগারেট ধরিয়ে কের্ বলল, 'কিন্তু দোস্ত একটা খাঁটি কথা কই—রইয়াসইয়া কাম করিস, নাইলে দেখবি পট্ কইরা পটল তুলহস্। আজকাল কাগজ খুললেই চোহে পড়ে পটাপট সব তাজা লোক মইরা যাইতাছে হার্ট ট্রাবলে'—

দেয়ালে বালিশ রেখে তাতে পিঠ লাগিয়ে উঠে বসে সুরুজ, করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'হ তাতো বুঝি; কিন্তুক কাম না কইরাই কি করুম, এতো জিনিশ চালু কইরা বইছি। আমি তো গাধার মতন খাটতে পারি জানস্ই, আর খাটতে আপত্তিও আছিল না। কিন্তুক মনডা বড় খারাপ—ভাবি এতো বিষয় সম্পত্তি, সংসার বাড়াইয়া কি লাভ !'

হঠাৎ এসব কথার গুরুত্ব আঁচ করে কাছাকাছি চলে আসে এবং তার দিকে তাকিয়ে একদন ঢাকাইয়া ভঙ্গিতে জিগগেস করলো, 'আবে হালাই কি অইছে তর খুইলা ক'না ?'

'কি আর কইয়াম দোস্ত,' সুরুজ মিঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'আমার রঙমহল অন্ধকার।'

হোহো করে হেসে উঠল কেরু মিঞা, তার কাছে গিয়ে কাঁধে একটা থাপ্পড় মেরে বলল, 'হেই পুরানা কথা। পরিবারের অসুখ তো কি অইছে, আরেকটা বিয়া কইরা ফালা। দেহসনা, আমি দুইড্যা করছি। দরহার অইলে আরও করুম্। ব্যাডা মাইন্ষের যদি পইসা থাহে তো মেয়েলোহের অভাব কি।'

'হ্যাঁ, তুই খুব ভালাই আছস্ দোস্ত, তর মতন অইতে পারলে আমার আর কোনো চিন্তা আচিল্ না।'

তখন কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কেরু বলল, 'যাইবি তুই? এহনই সময়, ল'যাই। একটা আচ্ছা মাল আইছে দোস্ত, নাম হিরণবালা। যেন বাংলার না, কাশ্মিরী মেওয়া। টস্‌টইস্যা গোলাপী আপেল। যেমুন ডাঁসা তেমুনই রসুয়া। কোমর বেকাইয়া যহন নাচ দেহায় আর তেরছিনয়নে চায়, দোস্তরে দোস্ত, কলইজা ছিঁড়া যায়। যেমুন পাছা তেমুন উরাৎ, সামনাটার দিহে তো চাওনই যায় না, আমাগো এই মেঘনার ঢেউ'—

'আর কইস্ না দোস্ত, কইস্ না। শইল উত্তেজিত অইয়া যাইতাছে।' সুরুজ সোজা হয়ে বসে বলল, 'পাকা বদমাইশ বইল্যা তোর তো একট্টা নাম আছে। মাইনষে ডরায়। কিচ্ছু কয় না। কিন্তুক আমার যে একটা মুখোশ আছে, যেইডা ছুঁইড়া ফেলাইতে পারতাছি না। তা'ও আবার ইলেকশনে খাড়াইবার ইচ্ছা'—

'ইস্, খুব ফেরেস্তার ভাব দেখাইতাছস, ঢাহাত গিয়া কই-কই যাস্ আমি বুঝি আর খবর রাহি না?' হঠাৎ দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে, তারপর মুখের কাছে মুখ এনে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, 'রঞ্জনার কাছে আমারে একবার লইয়া যানা দোস্ত। হুনছি এক রাইত এক হাজার, আমি দেড় হাজার দিয়াম!'

সুরুজ মিঞা উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'যা হুনছস্ ভুল হুনছস্। আমি অঞ্জনা-রঞ্জনা কারুর কাছে যাই না দোস্ত। ঠিক আছে, আমি যাই। তোর গোমস্তারে একটু কইয়া দে একটা নাও ঠিক কইরা দিতে, গুদামের দিকে অনেকগুলি নাও বান্দা আছে দেখলাম। জলদি বাড়িৎ যাইতে অইব আমার'—

অনেক বেগালতা ও উচ্চ কেরায়া, তবু মিলছিলো না; শেষ ইস্তক গোমস্তা লোকটা একটা মাঝারি আকারের বেপারি নৌকাতে যখন পাঠিয়ে দিল, আকাশ জোড়া তখন ঝড়োমেঘের ঘোর আলামত। ঘন-ঘন বিজলি

চমকাচ্ছে, আর পৃথিবী কাঁপিয়ে গুড়গুড় মন্দ্রধ্বনি। মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র মোহনার কাছে আসতে বাতাস বইতে শুরু করল। তা ঘাটে লাগতে না লাগতেই সাঁ সাঁ করে বৃষ্টি এসে গেল। দূরবর্তী এলাকার লোক, পাকা মাঝি-মাল্লা। গলুই শক্ত করে বেঁধে দিতে দেরি হল না। তারা বলছিল অপেক্ষা করে যেতে, কিন্তু ছাতাটা খুলে ধরে প্রবল আলোড়নের মধ্যেই সুরুজ তড়িদ্দৌড়ে, যতটা সম্ভব গতর বাঁচিয়ে বাড়ির দিকে চলল। বেশী দূর তো নয়। এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চিৎকার করলেও কেউ কারুর কথা শোনে না। কি আর কাশ্মিরী মেওয়া, সেদিন অপরাহ্নে গাছদোবায় চুপি-চুপি দাঁড়িয়ে দেখেছিলো কুয়োর ধারে আনমনা স্নানরতা জয়নাবকে, আহা কি ভরপুর যৌবন, বর্ষার উত্তাল ঢেউও তার কাছে হার মানবে। নিঃসন্দেহে ছলে-বলে কৌশলে ওকে চাই, অন্তত একবার চাই, বাঘের মতো দুই হাতে বুকের সঙ্গে জাবড়ে ধড়ে বাগ মানাবার জন্য নইলে, নইলে। নইলে সারা জিন্দেগী বরবাদ।

বাতাস ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দৌড়ে এসে বারান্দায় উঠলে দেখতে পায় রুছমত ভেজানো দরজার কাছে জলচৌকিতে বসে আধাঘুম আধা জাগনা অবস্থায় গুড়ুর গুড়ুর তামাক টানছে। আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো।

তক্ষুণি দাঁড়িয়ে ডাবাটা টিনের বেড়ায় ঠেকিয়ে রাখে তারপর বলল, আপনে আইছেন, ভাইছাব ? তাইলে আমি যাই।'–

মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে যায় সুরুজ মিঞার কাছে, বুঝতে পারে মা মেয়ে কেউ না এসে ওকেই পাঠিয়েছিল বিবি সাহেবকে পাহারা দিতে।

একটা হারিকেন ডিম্ করা ছিলো পালঙ্কের নিচে, ঘরের ভিতরে গিয়ে গামছায় গা-হাত মুছে কাপড় বদলাতে-বদলাতে দেখে পালঙ্কে মশারির ভিতরে অঘোরে ঘুমুচ্ছে পরীবানু। পাশে আরেকজনের জায়গা। ইচ্ছে করলে এখন গিয়ে শুতে পারতো; কিন্তু বাইরে চলে আসে। বারান্দায় জলচৌকিতে বসে তাকিয়ে থাকে অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির দিকে। মাছে মাঝেই গুড়গুর আওয়াজ, বিজলির চমক। অবিরাম একটানা ঝর্ঝর্ ঝম্ ঝম্ সবকিছু যেনো একাকার হয়ে যাচ্ছে আলো আঁধারিতে শাওন ধারায়। ঠোঁটের এক কোণে ঠোট্ট করে ফিস্ফিস্ আওড়ায় একটি শব্দ, জয়নাব !

৩

এক সময় বাতাস ও বৃষ্টি থেমে গেলে পৃথিবীটা ক্রমে শান্ত হয়ে এল। কিন্তু উপরে তখনো ধোঁয়াটে মেঘের আলোড়ন ক্ষণে ক্ষণে গুড় গুড় আওয়াজ। হালকা জিলহি নেভেজ্বলে। বারান্দা থেকে কপাট ঠেলে ঘরে যায় সুরুজ, পালঙ্কের তলায় রাখা হারিকেনের আলো বাড়িয়ে তা টেবিলের কোণে রাখলে পরীবানুর নিরক্ত মুখটা দেখা যায় মশারির ভিতরে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের ভিতর থেকে, পরীবান, এখন তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না অথচ এমন একদিন ছিলো যখন সে তার জন্য জান দিতে পারতো। সে সব যেন স্বপ্নদৃশ্যমালা। বয়স আর কতই ছিল তখন, বছর আঠারো আর সে ষোড়শী! বিড়ি কারখানার সারাদিনের কাজের শেষে বাজার থেকে চাল আসত পঞ্চবটি গ্রাম। ওর বাপজান আধাচাষী আধাকারবারী। জমিজমা অল্প ছিল বলে চাষাবাদের ফাঁকে-ফাঁকে হাঁস-মুরগি ডিম সংগ্রহ করে বেচতো। রাজ-কাছারিতে গিয়ে খাজনা দেয়ার সূত্রে পরিচয় হয়ে যায়ও তার পিতা পেয়াদার সঙ্গে, এবং ক্রমে তা গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। শেষে দু'জনে 'দোস্তি' পাতিয়েছিল।

অষ্টমী স্নানের সময়ে পঞ্চবটির মেলা থেকে কত রঙিন উপহার কিনে দিয়েছে; নকশি করা টুকরি ভরে। সন্ধ্যায় আধো অন্ধকারে নিয়ে গেছে বিন্নিধানের খই, মণ্ডা আর কদমা। কদমা খেতে খুব ভালোবাসতো পরী, ফকফকে সরু দাঁতের ফাঁকে রেখে করকর কামড় দিতো। আর লাল নীল সবুজ, দুই ডজন রেশমী চুড়ি এবং একজোড়া সোনালি কানফুল, সেবার কিনে জেবের ভিতরে লুকিয়ে নিয়েছিল, যখন তাদের মধ্যে প্রথম মনে কথা বলাবলি হয়। বেশ কাছেই তো, আওতার কাছ থেকে দেখা যায়; সেবার বলে-কয়ে ওকে নিয়ে এসেছিলো মেলা দেখাতে,

এক সময় বটমূলে ভিড়ের মধ্যেই, একটা রঙিন আংটি পরিয়ে দিয়ে বলেছিল, পরী তোমারে আমি বিয়া করুম,—

'যাঃ!' পরী শরম রাঙা ঠোঁটে বিরবির উচ্চারণ করেছিল, 'সুরুজ ভাই, আমার মনে হয় খালি আমি মইরা যামু গা, আমারে তুমি ছাড়'—

বাইরে মেঘের গুড়গুড় আওয়াজের নিচে ঈষৎ কাঁপা আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতে-থাকতে একটা ঘোর নেমে এসেছিল দু'চোখের তারায়, তার বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কিন্তু এই আচ্ছন্নতা কিছুক্ষণ, দিনের পর দিন ধিক্কার খেতে-খেতে হৃদয়টা কি অদ্ভুতভাবেই না ফিরে গেছে! পরীবানুর প্রতি মমতা আছে, যথেষ্ট আকর্ষণ আছে; কিন্তু এও মনে হয়, কখনো আর তাকে পাবে না। বিয়ের আগে থেকেই লক্ষ্য করেছে, পরীর মধ্যে একটা প্রচণ্ড অভিমান, আর পাগলামী, শহরে-বন্দরে ঘোরে খারাপ লোকেরা ইয়ারসাঙ্গাৎ—একবার যখন চরিত্রহীনতার সন্দেহ করেছে তা অকাট্য বদ্ধমূল।

এই মুহূর্তে ভিতরে অনুভব করে পরীর সন্দেহ অমূলক নয়, কুসঙ্গে পড়ে কয়েকবারই তো বেশ্যালয়ে গেছে এবং এখন জয়নাবকে সে চায়। জয়নাব জাবড়ে ধরে ছিন্নভিন্ন না করা ইস্তক নিরস্ত হবে না। হোক, হোক, বদনাম হোক। আসলে, মাঝে-মাঝে মনে হয়, তার মানসিক বিকৃতি ঘটে গেছে এবং তার চিকিৎসাও করা যাবে না। এই বিকৃতিতেই যেন সার্থকতা। অন্ধকারে, যখন একলা শুয়ে থাকে কিংবা এমনিতেও, যে কোন সময়, সে দেখে জয়নাবকে একলা পেয়ে আক্রমণ করেছে; ওকে ধরে চিতিয়ে ফেলেছে, তারপর কি পাছড়া-পাছড়ি। শুধু চিন্তা নয়, কখনো কল্পনা। একটানে কখনো নিবিড় স্বপ্ন। গত বছরের পাট মৌসুমে একটি স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু সে স্বপ্ন নয়, যেন জ্বলজ্বলে বাস্তব ঘটনা।

এ বাড়ির পিছনে আমগাছতলা ছাড়িয়ে বাদিকে কিছুদূর গেলেই পশ্চিম খামারের শুরু। এখন বিজন, কুলুবাড়ির ওদিকটার মাঝে মাঝেই খুচ আছে, কিন্তু এদিকটার উঁচু জমি। বর্ষার ঘোলা পানি হুট করে এদিকে আসতে পারে না! তখন ডাগর-ডাগর হয়ে উঠেছে পাটগাছ, সবুজ পাতার সাজ; ঠাঠা রোদ, দুপুর বেলার ভাঁপসা গরমে একটু একটু নড়ছিলো। মনে হয়, বারান্দায় বেতের মোড়ায় বসে নলমুখে তামাক খাওয়ার সময় দেখেছিলো ওদিকে যাচ্ছে, পরনে লাল পাড় সবুজ শাড়ি। পাড়ের নিচে সুগোল মসৃণ পায়ের গোছা; যেন একটা ঝিলিক মেরে রক্ত ওঠায় মস্তিষ্কের কোষে কোষে সাবধানে বেরিয়ে

ওদিকে গিয়ে দেখলো, জয়তুন দুধেল ছাগলটাকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। নদীর দিকে, কোথায় কোন্ সুদূরে তাকিয়ে আছে বেশ আনমনা, গুনগুন করছে। একটা আমগাছের আড়ালে থেকে সামনা-সামনি তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসতে থাকলে ও হঠাৎ চমকে উঠলো। কাচুলিহীন গুরু বক্ষভারে ঈষৎ আনত মুখ, সে জলদি কাপড় সামলে নেয় এবং কি যেন একটা আঁচ করে ছাগলের খুটা ছেড়ে দিয়ে দৌড় দিলো। খয়ের বহুত খয়ের। পাড়ার দিকে এলো না, যাচ্ছে পাট ক্ষেতের ভিতরে। মাথা সমান পাট গাছ, একটা আল ধরে হেলতে দুলতে ছুটে চলেছে, উঠছে নামছে মাংসল পাছা। একটু দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে যখন দেখে, তখন কাপড়ের নিচ থেকে উঁকি মারছে—। পাগল হয়ে যায় সুরুজ, প্রাণপন দৌড়ে গিয়ে প্রথমে দু'হাতে জাবড়ে ধরল, তারপর—

এমন দীর্ঘস্থায়ী পরিপূর্ণ স্বপ্নমিলন সেই প্রথম, সে জন্য তার স্বাদ ভুলতে পারে না ঃ শেষদিকে ও শিৎকার দিয়েছিল। আর এ প্রচন্ড আলোড়ন-বিলোড়নের পরে নেতিয়ে পড়েছিল ওর বুকের উপরে। একটু পরে ঘুম ভাঙলে দেখে লুঙি ভিজে একাকার।

হঠাৎ ঝিলিক মেরে উঠতেই মনের ভিতরে একটা উদ্দাম জোয়ার খেলে গেল। আঙুলের কাঁপা-কাঁপা চাপে সলতে কমিয়ে হারিকেনটা ঠেলে রেখে, দ্রুত বেরিয়ে আসে বারান্দায়। ওদিকে বৃষ্টির পানি সরার শব্দ। রবারের পামপ সুটা খুলে রাখে, পিছলা খেলে খালি পা'য়েই ভালো; উঠোন পেরিয়ে, দেয়াল ছাড়িয়ে, ইয়াকুব মাঝির বাড়িতে আসতে দেরি হল না। দেখে বুঝতে পারে, ঘরের ভিতরে বাতি জ্বলছে। এগিয়ে গেল। দক্ষিণ কোণের একটা ফাঁকে চোখ রাখল।

আদ্দিকালের গর্জনকাঠের প্রকান্ড চৌকিটা এখনো আছে ইয়াকুব মাঝির। তার উপরে ছেড়াকাঁথার উপরে তেল চিটচিটে বালিশটায় মাথা রেখে কোঁকাচ্ছে আর কি যেনো বকছে জ্বরের ঘোরে। শিয়রে জয়নাব জলপট্টি দিচ্ছে। এবং পা'য়ের দিকে রুছমত ঃ সে তার খালুজী ও ভাবী শ্বশুরের বাঁ হাতটা ধরে বেশ যত্নের সঙ্গে টিপছে। নিচে একটা চাটাইয়ের উপরে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে ব্যারামী আমিরন।

পুরাতন হারিকেনটা কমিয়ে নিচে রেখেছে, সম্ভবত কত বাতাস বৃষ্টি বদলা, জরুরী অবস্থার জন্য। এমন লাল কেরোসিনের কুপিটা জ্বলছে ভক্‌ভক্ ধোঁয়া উড়িয়ে।

আরেকটু ভালো মতো তাকালে, হ্যাঁ বেড়ার ফাঁকে সুরুজ মিঞার চোখে পড়ে রুছমত জয়নাব, যদিও একটু দূরে, তাদের চার চক্ষে যেন

গভীর মিলন। কাজ করছে ঠিকই কিন্তু মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখছে। একটি কালো পাথরে কোদাল পেশীবহুল মূর্তি, অন্যটি শ্যামলী প্রতিমা একদিকে অবনীত আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টি, অন্যদিকে বুঝি নীরব সম্মতির অগাধ হ্রদের গভীরতা।

হয়তো এসব সম্পূর্ণ মনের ভুল; তবু কেমন একটা তন্ময় প্রবাহে ভিতরটা মৃদু মৃদু কাঁপতে থাকে। এক মুহূর্তে ঝিলমিলিয়ে যায় হাজারো দৃশ্যমালা, যেন এক সূত্রে গাঁথা। তখন তত্তোটা তলিয়ে দেখিনি; কিন্তু এখন দেখছে, সব অর্থময় ছিল। চোখে ভাসছে পর পর ম্যাজিক লন্ঠনের ছবির মতো।

আগের বছর মৌসুমের একটু আগেই রুছমতকে ঠিক করে নিয়ে পাটচাষের কাজে লাগিয়েছিল।

মাসিক একশত টাকা দাবি করে, এবং তা মিলের কাজের মজুরি সাপ্তাহিক পঁয়ত্রিশ টাকার তুলনায় বেশি ছিলো না; কিন্তু শেষ ইস্তক রফা হল আশি টাকায়। বাসস্থান, খাওয়া দাওয়া ফিরি। উপরন্তু গামছাটা লুঙ্গিটা এক ঈদের সময় পায়জামাটা পাঞ্জাবিটা টুপিটা তো পাবেই। গিরস্তের পোলা, মিলের বদলে গিরস্তির কাজে লেগে মনে-মনে খুশিই হয়েছিল।

কিন্তু তার খুশির আসল কারণ ছিল নিশ্চয়ই জয়নাব।

জয়নাব তার খালাতো বোন। বয়সে খুব হলে বছর পাঁচেকের ছোট। ছেলেবেলায় নৌকো করে ওরা লালপুর বেড়াতে গেলে এক সঙ্গে খেলত।

রুছমতের বাপ শরাফত জাতচাষী কিন্তু বিশেষ জমিজমা ছিল না। চরের এককানিই ছিলো প্রধান ভরসা। ওটাতে বাণ্ডি তরমুজ করত।

পরণে টিয়ে রঙ ছোট শাড়ি জয়নাবকে হাত ধরে নিয়ে রুছমত চলে যেত চরে, ঘুরে ঘুরে বেড়াত, অচিন পাখির খেলা দেখত। নদীর পারে গিয়ে ঝিনুক কুড়াত। অনেক দিন দুপুরের পরেও ফিরত না। গাঙের পারে করকরে বালুর মধ্যে গর্ত ডুবিয়ে একে অন্যের হাত ধরে পাশাপাশি শুয়ে থাকত।

একবার তো কালবৈশাখী ঝড়ের মধ্যে পড়ে দু'জনের উড়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধির গুণে বেঁচে যায়। বেপারি বাড়ির খেতের সীমানায় কংক্রিটের খাম্বা পোঁতা, দু'জনে শুয়ে পড়ে একটাতে প্রাণপণে আকড়ে ধরেছিল।

গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত, আরো কত স্মৃতি। কিন্তু মাঝখানে সংসারের ধান্দায় বেশ কয় বছর যোগাযোগ ছিল না। সেজন্য ছোট্ট জয়নাবের

জায়গায় এক যৌবনবতী তরুণীকে দেখে হঠাৎ অবাকই হয়েছিল রুছমত, তার মুখে রা ফোটেনি। একদৃষ্টে শুধু তাকিয়েছিল।

ফাল্গুন মাস, জমি চাষ শুরু। মস্‌জিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আজান ভেসে আসার আগেই এদিকে গাছগাছালিতে বাঁশঝাড়ে কলকাকলি।

পুবভিটির ঘরের সঙ্গেই গোয়াল। তখন দুই বলদের একটি হাল, এবং একটি দুধের গাই ছিল।

পাখপাখালির ডাকাডাকির সঙ্গে-সঙ্গে শোনা যেত রুছমত খুটখাট শব্দ করতে-করতে লাঙ্গল জোয়াল এবং জোড়া বলদ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে নিজ তালুতে জিভের চট্‌চট্‌ কৃষকদের গরু চালনার পরিচিত আওয়াজ।

যদিও একটা সুবিধা, বাড়ির পিছন থেকেই পাট জমিগুলোর সীমানা এবং মাটি দোআঁশলা ও উর্বর এবং পরিশ্রম কম লাগে না। ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাস শুধু ঘাম দরদর খালিগতরে শীতল আরামের ছোঁয়া দিয়ে যায়, এবং আর কি? নিশ্চয়ই জয়নাবের উপস্থিতি।

একটা এল্‌মিনিয়ামের ভোলে করে জাউ কিংবা গরম ভাত ও সুটকির ভর্তা নাশতা নিয়ে যেতে দশটার কম বাজত না।

আমিরনের শরীর তখন ভালো ছিল: সেই সব তৈরি করে মেয়ের হাতে তুলে দিত। দেশলাই কাঠি ছিলো না, একদিন রান্না ঘরে সিগারেট ধরাতে গিয়ে শুনল, বলছে, 'অহনও প্যাডে তো কিছু পড়ে নাই—দেহিস্‌ রুছমতের লগে এক পাতে খাইতে বইস্‌ না। ডাংগর অইছস্‌ তো? মাইনষে দেখলে খারাপ কইব।'

একটা মধুর হাসির ঝিলিক খেলে যায় ওর ঠোঁটেমুখে, জয়নাব উবু হয়ে বসে নাশতার পাত্রটা গামছা দিয়ে বাঁধতে-বাঁধতে বলল, 'আমি খাইলে মাইন্‌সের কি? ইচ্ছা অইলে খাইয়াম'—

'ওমা! ছেরি কয়কি?' এমন সময় সুরুজকে দেখে বলল, আমিরন, 'হুনছ ব্যাডা সয়তানীডার কথা? মুহে যা আইয়ে তাই কয়, আর চিট্‌কি মারে। আরে তোর বয়সে আমরারে কাক পক্ষীও দেখতে পাইত না। আওতার ভিৎরে পরদায় থাকতাম। না ব্যাডা তাড়াতাড়ি একটা বিহিত কইরা দ্যাও। আমার খুব ডর লাগে, আজ কালকাইর পোলাপান'—

একটা সরু লাকড়ির আগুন থেকে সিগারেট ধরিয়ে সুরুজ বলল, 'না চাচি। জয়নাব তো সোনার মাইয়া'—

'না ব্যাডা, যত ভালাই অউক বদনাম অইতে কতক্ষুণ ?' আমিরন কড়াইয়ের গরম তেলে পেঁয়াজ ছাড়লে ছ্যাৎ করে উঠল, খরচুনে তা নাড়তে-নাড়তে বলল, 'কুড়ি ছোঁয়-ছোঁয় এই বয়সে ক্ষেতে-খামারে যাওয়া ঠিক না'—

'ই-স্ !' এই লম্বা শব্দটা উচ্চারণ করে এক দৌড়ে বারান্দা থেকে নেমে যায় জয়নাব, মা'য়ের দিকে জিভটা দেখিয়ে ভেংচি কেটে বলল, 'আমি খামারে যাইয়াম, জঙ্গলে যাইয়াম, গাডে যাইয়াম, সাগরে যাইয়াম, শহরে যাইয়াম, বন্দরে যাইয়াম দেহি ক্যাডা কি কয়। আমি কেওইর কিনা বান্দী নিহি ? আমি হাসুম্ খেলুম্ নাচুম্'—

'দেখছ ব্যাডা দেখছ, পোড়ারমুহির'—আমিরন চোখ পাকিয়ে কিল দেখিয়ে বলল, 'অজগা ফিরাআ, তোর চাইর আতপাও বাইন্ধা কোণা ঘরে ফালাইয়া রাহুম্'—

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সারা মৌসুম ধরে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল ঃ যদিও জানত রুছমত ছেলেটা নিতান্ত সরল প্রকৃতির, সাদামাটা। কাজে সে ফাঁকি দেবে না; কিন্তু সুরুজের আসল লক্ষ্য যে অধিক পাট উৎপাদন। এলাকা থেকে পাটের চাষ উঠে যাচ্ছে বলেই মনে হয় অথচ এইটাই ছিলো এককালে সবচেয়ে নামকরা পাটের এলাকা। আশুগঞ্জ ভৈরববাজার নরসিংদী পাটের কারবারের পিঠস্থান; তারপর নারায়ণগঞ্জ বিশ্ব সংযোগ কেন্দ্র। সময় বদলে যাচ্ছে; কেউ যাদের রক্ষা করে না, নিজেদের রক্ষা করা তাদের কর্তব্য। সেজন্য লোক ধানের দিকে ঝুঁকেছে, বিশেষ করে ইরি ধান। প্রায় প্রতি গ্রামেই ছোট-ছোট ইরি প্রকল্প গড়ে উঠেছে। ইরি ধানের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হাইজোং, উচ্চ ফলনশীল।

অবশ্য পেটের ধান্দা বড় ধান্দা অথচ দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচার জন্য কৃষিকার্যের ভোল পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু পাট যে সোনালি আঁশ, বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। বিভিন্ন সময়ে নানা আলোচনায়ও বক্তৃতায় শুনেছে যা এখন মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। অনবরত রুছতমের দিকে নজর রাখার অন্য একটা কারণও ছিলো, অনেকটা তখন ভাসা-ভাসা। ওরা খালাতো ভাইবোন। তবু বয়সটা খারাপ।

একটু দূরে থেকেই উঁচু ফাঁকে-ফাঁকে বাইরের দৃশ্য প্রায় সব দেখেছে। এক চাষের পর ইটা ভাঙা, মই দেওয়া তারপর গোবর ছিটানো। তারপর আরেক চাষ ঃ ফসফেট সার প্রদান, পাঁচবার। চৈত্র মাসের বাইশ

তারিখে বাইনের দিনে সে কি ব্যস্ততা আর অফুরন্ত উল্লাস। চষা জমিনের উপরে জয়নাব পাট বীজের পায়না নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ছিলো।

ছোট চারা জালাবার পর আঁচড়া দেয়ার সময়েও দুইজন। কেটে ফেলে আসমানে মেঘ জমে তারপর বাতাস এবং অল্প বৃষ্টি। দিন তিনেক পর বাৎলা ভেঙে দিতে যখন যায় তখন অবশ্য বাড়ির পাছদোয়ার আম গাছের নিচে থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

আচড়া দেওয়ার সময় একটানা এক ঘন্টা জমিনের এদিক-ওদিক করতে-করতে কাহিল হয়ে পড়লে জয়নাব গিয়ে আঁচড়ার মুটি ধরে সঙ্গে-সঙ্গে কি খিলখিল হাসি। নতুন অভিজ্ঞতা, কিন্তু পারদর্শি পিছিয়ে পড়ার পাত্রী সে ছিলো না। দিন দশেক পরে চারাবাছা, তারপর তিনতিনটা নিড়ি। সে সময় সে বাদেও চারজন মুনি সাত দিনের জন্য নিয়েছিলো। আষাঢ় মাসে বাছকাটা; সারা ক্ষেত জুড়ে চিকন-চিকন নলিতা তুলে ফেলতে হয় বাকীগুলোর মোটা হতে সুযোগ দেওয়ার জন্য। তখন আশের ধানে বর্ষার পানি এসে গেছে। মিলে দেশী পাটের চাহিদা কম সেজন্য সব খেতে আলবিলাতী মানে বগী পাট।

আসামের পাহাড়ী ঢলে শাদা পানি নেমে আসে শ্রাবণ মাসে, যখন মেঘনা ফুলে ওঠে এবং ব্রহ্মপুত্রও থই থই। নিচের মত রাস্তা পথ ঘাট ডুবে গেছে রেললাইন ধরে হাঁটে লোকজন ওদিকে দৌলতকান্দি ভৈরব-বাজার লাইন আর এদিকে দৌলতকান্দি মিল এলাকা।

বর্ষার পানি লক্‌লক্‌ করে। বুঝি পানি শুধু নয় পানির জোয়ার। পাট ক্ষেতে পানির খেলা। পর-পর উরাৎ সমান পানি কোমড় সমান পানি গলা সমান পানি। গতবার মাথা সমান পানিও হয়েছিল।

শেষে, শ্রাবণের শেষাশেষি কাটার সময় এসে গেল।

গ্রাম বাড়ির পিছন থেকেও শুরু করেছিলো। দেড়হাত লম্বা বগী-দাও হাতে একেবারে বুর দিয়ে-দিয়ে যখন কাটছিলো এদিকে গাছ তলায় দাঁড়িয়ে জয়নাব দেখছে। একবার অনেকক্ষণ আর ওঠেনা উপরে পাট গাছও নড়েনা তখন সে আর্তনাদ করে ওদিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

আসলে তা রুছমতের দুষ্টুমি ছাড়া কিছু ছিলো না ঃ একটু পরই ভেসে উঠে হাহা করে হাসতে থাকে ওর দিকে তাকিয়ে। শাসনের ভঙ্গিতে একটা কিল দেখিয়ে জয়নাব দ্রুত রান্নাঘরের আগুনের কাছে চলে এসেছিলো।

একগোছা চুল এসে পড়েছিলো জলপট্টি বদলে দেবার সময়, ডান-হাতে তা সরিয়ে বলল, 'সারাদিন কাম করো, আবার বাজারেও গেছিলা। অহন তুমি ঘুমাও গা রুছমতভাই—আমি একলাই পারুম্‌'—

রুছমত কি জবাব দেয় সুরুজ তা দেখবার জন্য বেড়ার ফাঁকে একটু ঘুরে দাঁড়ালো; সে সময় মৃদুহেসে ও জবাব দিলো, 'না-না। ঘুম আর কি। তোমার একলা ডর করবোনা

'ডর? কিযে কও রুছমত ভাই! আমার ডর করে না। এই যে হেই রাইতে ডাকইতের দল আইছিল নাওয়ে কইরা আমি গাছতলায় দাউ লইয়া খাড়াইছিলাম না? হাইঞ্জাবেলা আমি হ্যাওড়া গাছের তল্ দিয়া হাঁটতাম পারি, হ্যাঁ?'

'বুঝছি, বুঝছি। তুমি একটা পেত্নি!'

'আর তুমি? তুমি তো একটা ভূত! মামদোভূত!'

দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠল, কিন্তু বেশি শব্দ না-হয় সেজন্য হুঁশিয়ার। মুখের কাছে তর্জনি উঠিয়ে রুছমত বলল, 'খালুজানের ঘুম ভাইঙ্গো না।'

এতক্ষণে বর্ষণের পানি নামার সর্‌সর্ শব্দ মিইয়ে এসেছে এবং উপরে তাকিয়ে দেখে আসমানটা বেশ পরিষ্কার।

জয়নাব-রুছমত সম্পর্ক তো এই, আরশিলতার আয়নার মতো, মনে হয় তাতে গোপনীয়তার ছায়া পড়ে না। ওদের বিয়ে হতে পারে, দু'জনেই জানে নিশ্চয়ই; নইলে পরস্পরের ব্যবহার এমন মধুর ও সহানুভূতি সম্পন্ন হতো না। ব্যাপারটা আসলে গ্রামীণ ঐতিহ্য— এরকম ঘনিষ্ঠতাকে লোকে অন্যকিছু ভাবতে পারে না।

গতবার সারা মৌসুমেই দেখেছে, জয়নাব রুছমতকে যে খাতির করে তা ওর স্বাভাবিক কোমল স্বভাবেরই অঙ্গ।

এইভাবেই তো সে মোহাম্মদ আবু ফয়সল মানে তার ছেলে সবুজ মিঞার আদরযত্ন করতো, যখন সে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাংলাঘরে থেকে আই-এ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বরং বেশিই করতো ওর ফুটফরমাশ। এ বাড়িতে ওর মা আমিরুনদের খালাতো ভাই রুছমতের কাজ করার সুবাদে সে নিজে এমনভাবে জড়িয়ে ছিল তাকে, আলাদা করে ভাবা যেত না।

আবু ফয়সল, নামটা কেমন অচেনা। আসল নাম এরকমই নয়, কেউ তো বিশেষ ব্যবহার করে না। তারও মোল্লার দেওয়া নামটা ছিলো মোহাম্মদ আবু ফরহাদ। গ্রামের বিশেষ কেউ জানেও না; একমাত্র এখন বিয়ের কাবিন নামায় রয়েছে। ভোটার তালিকায়ও নাম সুরুজ মিঞা। আবু ফয়সল কিন্তু ওর নামের বিষয়ে বেশ সজাগ; ওর ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে এই নাম, ইন্টারমিডিয়েট রেজিস্টারেও তাই। কিন্তু সবচেয়ে বড়, ঢাকার পত্রপত্রিকায় ওর লেখাটেখা ছাপা হচ্ছে এবং

সেগুলোতে নাম দেয় আবু ফয়সল। ওর সুরুজ মিঞা নামটা এখন কেবল বাড়ির মধ্যেই চালু আছে; কলেজের অধ্যাপক এবং বন্ধু-বান্ধবেরাও ওকে, ফয়সল বলে ডাকে। সুরুজ স্ফূর্তিবাজ, প্রাণচঞ্চল ছেলে; কিন্তু মাঝে-মাঝে কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে মায়ের অসুস্থতা, ওর মনে দাগ কেটে আছে এর প্রায়ই উজ্জ্বল প্রকাশ করে।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ওঘর থেকে সকাল দুপুর বিকেল, মাঝে মাঝেই ওর ডাক শোনা যেত, 'জয়নাব! জয়নাব!'

হয়তো এদিকে গাছতলায় দাঁড়িয়ে পাটক্ষেতে চারাবাছা দেখছিলো, ডাক কানে যাওয়ামাত্র বাতাসে খোলাচুল ও টিয়ে রঙ শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ছুটে আসতো, এদিক থেকে কথা শোনা যায়, 'বারে বারে তুই কোথায় চলে যাস্ জয়নাব। যত্তো সব'—

জয়নাবের খিলখিল হাসি। ওর কন্ঠস্বর, 'আপনের এহানে বইয়া থাকলে কাম চলবো ক্যামনে! হি হি হি—ওদিহে রুছমতভাই ডাহাডাহি করে জয়নাব উক্কাডা জ্বালাইয়া দিয়া যাও! জয়নাব, পানি খাওয়াও'—

'ঠিক আছে, রুছমতকে ঠান্ডা রাখা উচিত।'

'অহন কন্, আপনের লেইগ্যা কি আনতে অইব। দুধ আনুম?'

'না, না। দুধ না।' সবুজের গলা, 'তুমি বসে-বসে যদি আমার লেখা দ্যাখ তাতেই আমি খুশি।'

'আমার কাম আছে যে, আপনের লেইগ্যা আমের ভর্তা বানাইয়া আনিগা।' বলতে বলতে জয়নাব বাংলাঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে।

'জয়নাব! জয়নাব! দাঁড়াও!'

এদিক থেকে আবার হাসি, 'আইতাছি!'

একটু পরেই আবার ওর কাছে দৌড়ে গেলে শোনা যায় জিগগেশ করল, 'কি ব্যাপার! এতো জলদি'—

'ভর্তাতো বানাইতে পারি নাই, ঘরে কাঁচা আম নাই—আপনে গাছে উইঠ্যা কয়ডা পাইড়া দ্যান না?'

'ও ঠিক আছে।' তক্ষুণি উঠে পড়ল সবুজ এবং বাইরে উঠোনের কোণে গিয়ে কাঁচামিঠা গাছে উঠল। উপরে ডাল পালার আড়াল থেকে কাঁচা আম ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে ফেলে দেয়, কোছর পেতে নেয় জয়নাব, যেনো এক রকম খেলা।

এইসব টুকিটাকি মন্দ লাগতো না সুরুজ মিঞার। এই জন্য যে তাতে সবুজের মনটা হালকা থাকে এবং নিঃসঙ্গতা কেটে যায়। গ্রামে ওর বন্ধু-

বান্ধব নেই বললেই চলে, সে জন্য প্রায় বিকেলে ভৈরববাজারে গিয়ে হোস্টেলে আড্ডা দেওয়া ওর অভ্যাস।

বাপজান না হয় বকলম, কিন্তু সে নিজে কোনোদিন কোনো গুরুত্ব দেয়নি পরীক্ষায়, নইলে এমন প্রস্তুতির সময় বাড়িতে একটা পুরো দিন হই চই করে কাটিয়ে দিতে পারত ?

এখন ভৈরবে অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, একটা নাট্যগোষ্ঠির নিজেও সভাপতি। কিন্তু তরুণ কবিদের সংগঠন 'মেঘনা কবিতা কেন্দ্র'ই সবচেয়ে বিখ্যাত। চৈত্রের শেষদিনে তারা এই বাড়িতে করল, বসন্তকালীন কবিতা উৎসব। সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা, কবিতা পাঠ ও গান। আধঘন্টা বিরতি, অবশেষে দু'টোয় পোলাও কোরমা ভূরিভোজন। ছেলের উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়েছিলো পরীবানু, এমনকি রান্নাঘরে জলচৌকিতে বসে আমিরনকে দেখাতে থাকে এবং প্রধান সাহায্যকারিণী জয়নাব। সবুজের নির্দেশে কিছু সেজেছে, সেই বাংলাঘর ও বাইরের সাজানো উঠানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছিল। এখন শরবত, তখন চা, পানির জগ ও গেলাস নিয়ে গিয়ে আবৃত্তিরত কোনো কবির হাতে পানি ভরতি গেলাস প্রদান। শিক্ষিত লোকের কারবার কে আর বোঝে; কিন্তু তবু আনন্দের একটা কিছু ঘটছে, সে জন্য জমায়েত মন্দ ছিল না।

বাংলাঘরের সামনে বারান্দার কাছে একটা বড় শোওয়ার চৌকি, তার উপরে টেবিল চেয়ার সাজিয়ে মঞ্চ বানিয়েছিলো। শ্রোতাদের মধ্যে প্রবীণরাও ছিলেন। কবিতা উৎসবের সময় কর্মরত জয়নাবকে চেয়ে দেখতে বেশ ভালো লাগছিলো। পরনে বাসন্তী জমিন চেক শাড়ি, গলায় পুঁতির মালা। হাতে ছিলো রেশমি চুড়ি, চলবার সময় রিমিঝিমি করে বাজত।

কিন্তু আরেকদিন যে সেজেছিল, তা আরো চমকপ্রদ। ভাদ্র মাসের প্রথম দিকে তখন ঘরে পাট তোলার সময়।

এর আগে শ্রাবণ মাসের পুরা শেষ সময়টা জুড়ে ভীষণ খাটুনি গেছে, রুহুমতের সঙ্গে জয়নাবেরও। ডুবিয়ে-ডুবিয়ে ক্ষেত কাটা কম কথা নয়, যদিও আরো কয়েকজন কামলা ছিলো। নলিতায় হাত বেঁধে পেঁতি দেওয়াও সময় সাপেক্ষ; তারপর গলা পানি দিয়ে টেনে-টেনে এনেছে বাড়ির কাছে লুহু পর্যন্ত; তলা দিয়ে বাইলা বেঁধে, উপরে কচুরিপানার আচ্ছাদনে, পানির আধহাত তলি ডুবিয়ে রাখার কাজটা শেষ হলে একটু শান্তি। পঁচা পানিতে নলিতা পঁচে বিশ দিনে। কিন্তু ভালো পানিতে একটু বেশি সময় লাগে, পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন। নলিতা এসে গেলে সাইর বেঁধে পাট লওয়ার পাল্লা। নৌকা ভরতি ভিজা পাটের

লাছি নিয়ে রুছতম কামলাদের সহ চলে যেত রেললাইনে, আর এদিকে বাইরের উঠানে পোঁতা বাঁশের আড়া বাঁধা খুঁটিগুলোতে ভিজা পাটের লাছি খুলে খুলে রোদ্রে শুকাতে দিত জয়নার। একে বলে পাট লাড়া, মনোযোগ ও যত্ন ছাড়া ভালো হয় না।

হঠাৎ করে সবুজ ঢাকা থেকে একজন ফটোগ্রাফার নিয়ে সকাল ন'টার দিকে বাড়ি এসে উঠেছিল।

আমিরন নাশতা তৈরির জোগাড় করছে, এদিকে পালঙ্কের উপরে পরীবানুর কোমরে চাপ দিচ্ছিল জয়নাব; বন্ধুকে বাংলাঘরে বসিয়ে দৌড়ে এসে ডেকে বলল, 'মা ! মা !'

'কিরে সবুজ নিহি ?' একটু পাশ ফেরার পর ছেলেকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে হাতভর করে উঠে বসে পরীবানু বলল, 'ঢাহাৎ থে আইছস্ ? কি ব্যাপার ?'

সবুজ কাছে এসে মায়ের হাত ধরে, পরীবানু ওর মাথায় আদর করতে থাকে। ও বললো, 'ইউনিভারসিটিতে আবার গোলমাল শুরু হয়েছে, হলে থাকা বিপজ্জনক। দু'দিন বেড়াতে এলাম। আমার বন্ধু একটা সচিত্র ম্যাগাজিনের ফটোগ্রাফার। সে একটা এলবাম তৈরি করছে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ পাটের উপর। আমি কথা দিয়েছি সাহায্য করবো। তোমার শাড়ির আলমারির চাবিটা দাও না মা

'কেন রে, হেই দিয়া কি করবি ?'

'কালারফুল, মানে বেশ রঙচঙে দু'তিনটা শাড়ির দরকার। জয়নাবকে পরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পোজে শট্ নিতে হবে।' এরপর জয়নাবের দিকে তাকিয়ে হুকুম করেছিল, 'জয়নাব ! জল্দি আমাদের নাশতা দে ! তারপর হাতমুখটা ভালোমত ধুয়ে আয়। আমি শাড়ি দেখছি।'

সেদিন, যতক্ষণ রোদ ছিল, অনেক ছবি তারা তুলেছিল, প্রথমে জয়নাবের পরে রুছমতের পৃথক পৃথক। শেষদিকে একসঙ্গেও কয়েকটি শট্ নিয়েছিল। সব খেয়াল বৈকি।

৪

এদিক ওদিক পোকামাকড়ের ঝিপ্‌ঝিপ্‌ টিপ্‌টিপ্‌ আর পিছনের বাঁশঝাড়ের কাছাকাছি পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ রাত ক্রমে ঘোর হয়ে আসছিল। কুপিটা স্তিমিত প্রায়, কেরোসিন ফুরিয়ে এসেছে; লাল শিখার তেজ আরো কমলে হারিকেন ওঠানো ছাড়া উপায় থাকবে না। বাপজানের পায়ের দিকে বসেছিলো, ততক্ষণে ঝিমোতে শুরু করেছে, বুঁজেগেছে চোখজোড়া, দু'তিনবার ঢিব্‌ খেলো।

গভীর তন্দ্রাজড়ানো চোখে কষ্টে তাকিয়ে আবার বলল জয়নাব, 'তুমি যাও রুছমত ভাই। ঘুমাইয়া যাই গা। বেইন্যালা বেলা আবার উঠতে অইবো না?'

'ও হ্যাঁ।' এবার আর আপত্তি করে না রুছমত, উঠে দাঁড়িয়ে একবার টানা দিল। উঠে গিয়ে দরোজার কপাট খোলে, এবং নিচে পারাবার আগে বলল, 'তুমিও হুইয়া থাহ জয়নাব।'

ওকে বেরুতে দেখে সট্‌ করে পিছন দিকে সরে গিয়েছিল সুরুজ মিঞা, ভেজা উঠানে খড়মটা বাঁচিয়ে পুবের ঘরের দিকে চলে গেলে, উঁকিঝুঁকি মেরে আবার এদিকে আসে। জয়নাব তখনো ওর বাপের শিখরে জলপট্টিটা রাখল টিপেটিপে ঠিক করে। ওরা দু'জনেই ঘুমুচ্ছেন অঘোরে, নাক ডাকছে ইয়াকুব মাঝি। এটাই সুবর্ণ সুযোগ। প্রথমে নাক বাড়িয়ে দেখল, তারপর মৃদু ঠেলায় কপাটটা ফাঁক করে ঘরে ঢোকে; সঙ্গে সঙ্গে তাকায় জয়নাব, সে বিস্মিত স্বরে জিগগেশ করে উঠল, 'কে? ও ভাইসাব! অত্তো রাত্রে কইথে আইলেন?'

'চুপ জয়নাব! আস্তে কথা ক—হুনলাম এদিগে কান্না, ভাবলাম চাচানি মইরা যাইতাছে!' চোখে অস্বাভাবিক চাউনি তার শরীরটা মৃদু মৃদু কাঁপছিল; সাবধানে দু'একবার পা ফেলে বারবার আচমকা গিয়ে এক ফুঁয়ে কুপিটা নিভিয়ে দিল এবং জয়নাব চিৎকার করে ওঠার

আগেই পিছন থেকে ওকে দু'হাতে জাবড়ে ধরে। তখন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছিল, 'খবরদার টু শব্দটি করবা না, তইলে এই গলা টিইপ্যা ধরুম। মাইরা ফালাম্‌ তরে।'

'ভাইসাব, আপনে পাগল অইয়া গ্যাছেন গা।'

'অয়ো, পাগলই তো। তোর ল্যাইগা পাগল অইছি জয়নাব, তরে না পাইলে আমি বাঁচুম না।'

'ভাইসাব, মায়ের ঘুম খুব পাতলা, লইড়া উঠছে। জলদি বাইর অইয়া যান—নাইলে কেলেংকারী'—

'কি আর কেলেংকারী অইবো, তুইতো জানস তোর বুবাই কিচ্ছু দেয় না। আমি তোরে বিয়া করুম। সব জমিজমা, তোরে লেইখ্যা দিয়াম। দিয়াম অনেক শাড়ি জেওর অলংকার'—পিছন থেকে কোলের উপরে কাউরি মেরে যখন ওর পিনোন্নত ভরাট মাংসল স্তন জোড়া ধরতে ও ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিতে চেষ্টা করছে তখন জয়নাব একটা প্রবল মোচড় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে ফেলল। ওকে ন্যাংটা করে ফেলেছিল। আন্দাজে হাতড়ে ফের শাড়ি কাপড়টা নেয়, অনুচ্চস্বরে বলল, 'কি কইলেন ভাইসাব। ঠিক আছে, অক্ষণই বার অইয়া আপনে আপনার বাংলাঘরে যান। আমি আইতাছি।'

সুরুজ সামনা-সামনি বুকে জড়িয়ে ধরে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'হাছাই আইবা তো ?

'হ, আইমু। দেরি কইরেন না, যান্‌ জলদি'—

'খালি আইলে অইবো না, দেওন লাগবো।' একটু যেন শব্দ হল চৌকিতে, এক্ষুণি ওকে ছেড়ে দিয়ে সাবধানে পা ফেলে কপাটের কাছে গেল, তারপর আস্তে-আস্তে খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। জয়নাব অন্ধকারে কাপড় পরে নেয়, সে এদিকে এসে ভালোমত খিলটা লাগিয়ে দিল।

এদিক-ওদিক চোরের মত তাকাতে-তাকাতে সাবধানে পা ফেলে বাংলাঘরের ভিতরে কাঠের পার্টিশনে তৈরী কামরায় এসে চৌকির ধারে বসল, তখন ভিতর থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। নিশিতে পাওয়া লোকের মত অদ্ভুত অবস্থা : সারা শরীরে শিরায়-শিরায় ধমনীতে শিরশির করে একটা ঠান্ডা প্রবাহ চলছিল এবং চিরচির করছিল বুকের ভিতরটা ; কিন্তু কাকে এত ভয় ?

পিছনে, বিছানার উপরে দু'হাত ভর করে জান ছেড়ে দেয়, মাথার ভিতরটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে থাকলে চোখ বুজে কিছুক্ষণ স্থির।

আস্তে আস্তে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে থাকে এবং তার মনে হয় সে যা করতে যাচ্ছে তা তো অপরাধ নয়। তাকে বেঁচে থাকার জন্য এ

প্রয়োজন। কি অর্থ আছে এই বিষয় সম্পত্তির সাজানো সংসারের যদি এমনিভাবে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে হয় ? পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করল এবং সেই দেশলাইলের একটা কাঠি জ্বালে। সেই আগুনের আভায় নিজের হাত পা পোশাককে মনে হয় অচেনা যেন অন্য একটা বিদঘুটে আদমীর অঙ্গপ্রতঙ্গ, আবরণ; সময় কেটে যেতে থাকে। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে করতে ধোঁয়া ছাড়ে এবং কানখাড়া করে রাখে। যে কোনো মুহূর্তে জয়নাব এসে পড়বে; শত হলেও কুমারী কন্যা তার দ্বিধা সংকোচ আছে বৈকি ?

কিন্তু, কিন্তু। কোথায় সেই মৃদু পথধ্বনি, কোথায় দরোজায় টুকটুক আওয়াজ ? বাইরে গাছের আড়ালে পাখির নড়াচড়া, একটু বাতাস বইছে। আকাশে বোধ হয় মেঘ জমেছে আবার, মাঝে মাঝে দিগন্তের দিকে গম্ভীর গুড়গুড় ধ্বনি।

একবার হঠাৎ মনে হয় জয়নাবকে বাগ মানাতে পারবে তো ? বয়স ওর আঠারোর বেশি নয়, বর্ষার নদীর মত পূর্ণ যৌবনা। পুরুষের সঙ্গে প্রথম মিলন। সংকোচ থাকলেও অনেক আশা নিয়ে আসবে—যদি ব্যর্থ হয় তো মুশকিল। সুরুজ ভাবতে ভাবতে হাঁটতে এবং উত্তেজিত হতে পারছে কিনা নিজেকে দেখে পরখ করে। অনেক হয়ে গেলে দরোজার কাছে গেল। কপাট আস্তে ফাঁক করে ওদিকে তাকায়, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।

তাহলে কি জয়নাব একটা ভাওতা দিয়েছে ? এখানে আসার সম্মতি আসলে তাকে ঘর থেকে বার করে দেয়ার কৌশল ? ক্রমে ভোর হয়ে এল পাখপাখালির কলকাকলি; দল বেঁধে পাহাড়ী হাঁসের ঠুপঠুপ পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যাওয়ার শব্দ। নদীর ধারে মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলে চৌকির কোণ থেকে উঠে বাইরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। আপন মনে বিড় বিড় করে, রাখ্ শালী তোরে আমি দেইখ্যা দিয়াম ! আমার নাম সুরুজ মিঞা, আমাকে তুই বুদ্ধিতে হারাইবি ?

পরদিন দুপুরের দিকে আলুথালু কেশে ও-বাড়ির পিছনে প্রায় হাঁটু পানিতে নেমে জয়নাব ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলো, 'রুছমত ভাই ! ও রুছমত ভাই !'

পাটক্ষেত কাটতে কাটতে পাঁচখানি জমির ওদিকে চলে গিয়েছিল, পানির তলা থেকে উঠে এক সময় জয়নাবকে দূরে দেখতে পেলো রুছমত, তখন সে থামলো এবং গলা বাড়িয়ে হাঁকতে-হাঁকতে জিগগেস করলো, কি কও জয়নাব, কি খবর ?

জয়নাব চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি আও রুছমত ভাই! বাজান কেমুন জানি করতাছে, জলদি আও—'

পরপর হাতা সাজিয়ে প্রায় ক'টা পেঁতি বাঁধা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো, রুছমত থেমে গেলো।

খালি গতর, লুঙ্গিটা গাদা অবধি তোলা, পাছার উপরে নেংটি বাঁধা—কোনোদিকে খেয়াল নেই, জয়নাবের পিছু পিছু তুড়িদৌড়ে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখে, সত্যই ইয়াকুব মাঝির অবস্থা খারাপ। হাসফাস করছে খুব, চোখজোড়া একেকবার বড় বড় করে তাকাচ্ছে। রুছমত যেতেই চিনতে পারলো, দুর্বল একটা হাত তুলে ওকে ছুঁতে চাইলো, কিন্তু পারে না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'রুছমত বাবা! সুরুজ মিঞারে অক্ষণই লইয়া আও গা। আমার কিছু কথা আছে।'

সারারাত একটানা জাগনা থাকায় জয়নাবের ঘুম তখনো সরেনি, সে বিহ্বল; রুছমতের একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'তাড়াতাড়ি যাও রুছমত ভাই। একজন ডাক্তারও লইয়া আইও—'

কাছাকাছি কুঁড়েঘর চটপটে বালক মাঝি কোরবানদের, ওকে বাড়িতে পাওয়া গেলো। কাতর বেগালতা করে নিয়ে আসে। কোরবান ছইর ধরে, আর রুছমত পাছায় বসে বৈঠা, দু'জনে জলদি-জলদি ইয়াকুব মাঝির কেরায়া ডিঙিটা বেয়ে নিয়ে এসে কমলাঘাটে বাঁধলো।

ভেজা লুঙি, ভেজা শরীর, রুছমত গদীতে ঢুকে বিনা ভূমিকায় জোরে জোরে বলল, 'ভাইসাব! খালুর অবস্থা খুব খারাপ, আপনেরে অক্ষণই যাইতে কইছে। কি কথা আছে—'

বেপারী-মহাজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মশগুল, সুরুজ মিয়া প্রথমে প্রায় হকচকিয়ে গেলো; কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝতে পেরে বলতে লাগল, 'আমি কইছিলাম না? অসুখটা ভালা না, ঢাহাৎ চলো, হাসপাতালে ভর্তি করাইয়া দিমনে—হুনলো না। অহন মরুক—'

'ভাইসাব! আপনে মাফ কইরা দ্যান, অবুঝ মানুষ।' রুছমত হাত জোড় করে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললো, 'আপনে না দেখলে দেখবো ক্যাডা। গেরামে আর মানুষ আছে? গরীবের দুঃখে আপনের মনডাই তো কান্দে। আপনে লন জলদি—আর আমারে আমার মাইনা থে একশ ট্যাহা দ্যান,—ডাক্তার লইয়া যাইয়াম—!'

শুনে কপাল কোচকায়; বাইরে বেশ বিরক্ত হলো, কিন্তু ভিতরে কেমন একটা উল্লাস অনুভব করে। সুরুজ মিঞা পকেট হাতরে বলল, 'ট্যাহা চাস্ লইয়া যা। আমার জরুরী কাম, এই জেন্টলম্যানরা বহুৎ দূর থাইক্যা আইছেন।'

একশো টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিলে যেন হাতে আসমান পায় রুছমত, কৃতজ্ঞতায় ওর চোখমুখ শিরশির করে কাঁপতে লাগল ! আগন্তুক ভদ্রলোকেরা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সুরুজ মিঞার দিকে, ভাবছেন গরিবের প্রকৃত বন্ধু।

'আমরা তাইলে ডাক্তার লইয়া যাইতাছি, ভাইসাব আপনে তাড়াতাড়ি আইয়েন। খালু আপনার অপেক্ষায় আছে।' বলতে-বলতে, ফেরবার সময়, চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে নিজেকে সামলাতে সামলাতে বেরিয়ে এল।

এলাকায় কাজী ডাক্তার এক কিংবদন্তী, তাঁর নাম শুনলে আজরাইলও নাকি থমকে দাঁড়ায়। রুছমতের কলজে বড়; পঞ্চাশ টাকা ভিজিট দিয়ে তাকে নিয়ে গেল। রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন, বুঝে উনি ওষুধপত্র সিরিঞ্জ হ্যান্ডব্যাগে করে নিলেন।

সবাই ভিড় করেছে, আশেপাশের দু'দশ বাড়ি থেকেও এসেছে। ওরা দেখল, ডাক্তার দুইকানে লতির মতো কি একটা লাগিয়ে একটা গোল চাকতি দিয়ে বুক পরীক্ষা করলেন। রোগীকে বললেন, জিভ বার করতে। বার করলে টর্চ ফেলে দেখলেন এবং পরক্ষণেই, গম্ভীর মুখে অথচ সাবধানে হাতের বাজুটা টেনে নিয়ে একটা ইনজেকশন করলেন। এক টুকরো কাগজে খচ্‌খচ্‌ করে কি লিখে রুছমতের হাতে দিলেন এবং বললেন, 'ওষুধটা কলেজের সামনে মডার্ন ডিস্‌পেনসারিতে পাবে। আমার সঙ্গে চল। এক্ষুণি আনতে হবে। আজ বিকেলে এক ডোজ, আর তিন রাত্রে ঘুমোবার এক ডোজ। পরদিন থেকে রোজ তিনবার।'

ওরা বেরিয়ে গেলেও লোকজনের ভির কমেনা, অনেকে শুনে এসেছে ইয়াকুব মাঝি মরছে, তার ঢেউ উঠেছে।

কিন্তু ওরা থাকতে থাকতেই দেখে, ইন্‌জেকশনের আধ ঘণ্টার মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে ইয়াকুব মাঝি, এখন মরছে না।

অপরাহ্ন হয়ে গেলে পুঞ্জ-পুঞ্জ কালোমেঘে আবার আকাশ ছেয়ে গেল।

বিমর্ষ জয়নাব বাপের শিয়রে বসে ঝিমোতে-ঝিমোতে যেন প্রহর গুণছিল।

একটা ফল-মূলের পোটলা হাতে ধরে সুরুজ এসে প্রবেশ করতেই সে নড়েচড়ে বসল। জ্বর অবনত মুখ, বিষণ্ন চাউনি।

চৌকির পাশে বসে কপালে হাত রাখে, তারপর হাত ধরে নাড়ি দেখতে-দেখতে বলল, 'এখন জ্বর নাই, সবকিছুই স্বাভাবিক।'

এতক্ষণ যেন অচেতন হয়েছিল, হঠাৎ আকাঙ্ক্ষিত ছোঁয়া পেয়েই যেন চট্‌ করে তাকাল ইয়াকুব, সুরুজ মিঞার হাতটা ধরে ভেউ ভেউ করে

কেঁদে উঠল। ভাঙা গলায় বলল, 'আইছ তুমি? আল্লাহ আনছে তোমারে? ঠিক আছে। আমার কপাল ভালা। আমি তো যাইতাছি চাচা, আমার পরিবাররে তুমি দেইখ্যো। জয়নাবডারে ভালা একটা বিয়া দিও, তোমার হাতে সইপ্যা গেলাম—'

সুরুজ মিঞা শান্ত্বনা দিতে লাগল, 'মরবা না চাচা, তুমি মরবা না। অত কাতর অইতাছ ক্যান। ডাক্তার দেখছে, ওষুধ দিতাছে, তুমি ভালা অইয়া যাইবা গা। কোনো চিন্তা কইরো না, তোমার চিকিৎসার যত ট্যাহা লাগে আমি দিয়াম—'

'তুমি গরিবের বাপ-মা, একশ' বছর বাঁচ বাবা হাজার বছর বাঁচ।' ইয়াকুব মাঝি কাত হয়ে কষ্টেসৃষ্টে বলল, 'আমি কতো কড়া কইছি তোমারে, গাইলও দিছি। আমারে মাফ কইরা দিও। দোয়া করি তুমি মন্ত্রী অও, পিচিটিন অও। দুনিয়া জাহানে তোমার নাম ছড়াইয়া পড়ুক—!'

'কোনো চিন্তা কইরো না চাচা, তবু কথা দিলাম আমি সবসময় তোমার খোঁজ খবর রাহুম। আর জয়নাব তো—'

ইয়াকুব মাঝি তাকিয়ে দেখে জয়নাব চৌকির পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে বলল, 'তুই একটু পাছদোরায় যা মা—'

জয়নাব চলে গেলে সুরুজ বলল, 'জয়নাব তো আমার কাছে-কাছে থাহে—হেইর লাইগ্যা আমার খুব প্যাট পুড়ে।'

'বাবা সুরুজ, আমার একটা কথা রাখবা?' আকুলভাবে পা ধরে ইয়াকুব বলল, 'ছোটবেলা যে রুছমত আর জয়নাব একলগে মানুষ অইছে। আমরাও দুইপক্ষেরই ইচ্ছা। তুমি বাবা জুদি দায়িত্ব লও তাইলে নিচিন্তে মরতাম পারি।'

'কি যে কও চাচা, দায়িত্ব নিতাম না মাইনি? এতে তো আমরাই লাভ—দুইজন একলগে আমার বাড়িৎ থাকবো, কাম করবো, আর আমি ফুর্তিতে ঘুইরা বেড়াইয়াম। জয়নাব আমার ছুড়ু বইন, হেইর বিয়াতে কাপড়-চোপড় জেওরপাতি আমিই দিয়াম। জয়নাব! জয়নাব!' ডাক শুনে জয়নাব ধীর পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালে সুরুজ বলল, 'অতো চিন্তা করস্ কি, ব্যাকুল! আমি তো সবসময়ই আছি। জলদি এক গেলাস পানি খাওয়া—খুব পিয়াস লাগছে।'

পানির গেলাস নিয়ে এসে বাড়িয়ে দিলে আঙুলে আঙুল লাগায় সুরুজ, জয়নাব বোঝে ইচ্ছাকৃত; সে তক্ষুণি সরিয়ে নেয় নিজের আঙুল। এক চুমুকে গেলাসের পানির সবটা খেয়ে সুরুজ হেসে উঠল।

রাত্রে বাপের অবস্থা আরো একটু ভালো দেখলে পরীবানু যখন ডেকে পাঠালো জয়নাব আর কোনো ওজর তুলল না। সে এসে পরীবানুর কোমর মালিশ করতে লেগে যায় এবং ওদিকে বারান্দায় রুছমত, পরিপাটি তামাক সেজে বাড়ির কর্তার হাতে নলটা এগিয়ে দিল। একটা টান দিয়ে কি মনে হতে সুরুজ বলল, 'ভিতরে দিয়া যা।' ভিতরে এসে খাবার টেবিলের একটা চেয়ার টেনে বসে। রুছমত ফর্সি হুকোটা দু'হাতে ধরে নিয়ে রাখলে সেদিকে তাকাল।

পালঙ্কের উপর পরীবানু, চুপচাপ উপর হয়ে শুয়ে তেলে রসুনে মালিশের আরাম গ্রহণ করছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সুরুজ ভাবলো, এখন সময়টা উপযুক্ত, কিছু কথা অন্তত বলা সম্ভব। বিশেষ, জয়নাব যখন আছে, আরও নরম করার মতো কিছু দাওয়াই ছাড়া যায়।

যেনো বরাবর কতই খাতির, তেমনি ভাব করে পরীবানুর উদ্দেশ্যে বলল, 'পরী হুনছ? ইয়াকুব চাচার কীর্তি। একটু জ্বর আইছে, আমারে বাজারের যে তেলব দিয়া আইস্যা মাফ চাইতাছে। আরে আমার কি শক্তি আছে। আমি মিনিস্টার না ভাইস প্রেসিডেন্ট! জানে খাট্‌ছি, আল্লাহ কিছু রহম করছেন, এই তো? অসুখ বিসুখ অইলে মাইনষের মন নরম অইয়া যায় ঠিকই, তহন কতো কথা মনে আইয়ে। জয়নাব তো খাড়াইয়াই আছে, রুছমতও কাছেই—কি আর কইয়াম। তবে ইয়াকুব চাচার চিন্তাধারাডা ভালা লাগল। জীবনডা পদ্ম পাতার পানি, টলমল করতাছে—কুম্বালা কারা ঝইরা যাইবো কেউ কইতে পারে না। তাই কর্তব্য কাম যতো জলদি শেষ করা যায়, ততই ভালা—'

'কম্‌রের ব্যাদনাডা আমার খালি বাড়তাই আছে, উঁহ্‌ উঁহ্‌ উঁহ্‌—'

'হের লাইগ্যাই তো কই, জয়নাব তোমার লগে লগে থাক্‌।'

'যা করবার কইরা ফালাইলেই অয়, হের লাইগ্যা আবার মতামত জিগাইতে অইবো নিহি?'

'না, না পরী, এসব কামে মতামত লাগে। আমি জেওর দিয়াম, কাপড় দিয়াম—দু'চারজনের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করুম। একদিন বইয়া পান চিনিও তো খাওয়া দরকার।'

পিতলের ছোট বাটি কাত করে হাতের কোষে রসুন তৈল নিয়ে জয়নাব পরীবানুর কোমরে আলতোভাবে লাগিয়ে দেয় তারপর একটু ঝুঁকে একেকবার জোর দিয়ে দিয়ে চাপ দিতে থাকে, খোলা কালোচুলের আড়ালে মুখের যেটুকু দেখা যায়, তাতে একটা কোমলতার আভা।

এমন সময় আকাশ-ছাওয়া পুঞ্জমেঘের গুড়গুড় গভীর ধ্বনিতে মাটি ঘরবাড়ি গাছপালা কেঁপে কেঁপে উঠল, এবং একটু পরে শোনা গেলো, হেলানো-দোলানো বাতাসের সঙ্গে ঝরঝর আওয়াজে বৃষ্টি যেনো দৌড়ে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঝম্‌ঝম্‌ করে বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

হকচকিত রুছমত তাড়াতাড়ি মাথলাটা মাথায় চাপিয়ে একলাফে নেমে যায় উঠোনে, তারপর ইয়াকুব মাঝির পুব ভিটিতে তার ঘুমোবার ঘরের দিকে চলে গেল।

একটানা অবিশ্রাম বৃষ্টির শব্দ; ওদিকে কপাট ও চতুষ্কোণ ঝোপের ফাঁকে-ফাঁকে বাতাস এসে হারিকেনের শিখাটা কাঁপতে লাগল। একেক সময় খুব ছোট হয়ে আসে, বুঝি নিভেই যায় পরীবানু বালিশে হেলান দিয়ে মশারি খাটাতে বলে কিন্তু ভাবভঙ্গিতেই শুধু বোঝা যায়, কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট। একটু এগিয়ে এসে সুরুজ চারকোণার চারটি কাঠের ডাণ্ডার দিকে দড়ি ধরে জয়নাবকে সাহায্য করে।

'তুই আমার লগে হুইত্যা থাক, জয়নাব।'

নিজের বালিশের ধারটা একটু বাড়িয়ে দেয়, জয়নাব পরীবানুর পাশে শুয়ে আড়াল হয়ে থাকতে চায়; কিন্তু সে যে বড় হয়েছে!

ক্রমে বাতাস পড়ে গেলে বর্ষণ আরো ঘোর হয়ে আসে এবং ওরা যখন ঘুমুচ্ছে হারিকেনের শিখাটা কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেলো।

মেজাজটা কেনো জানি ভালো, আজকে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি, বেফাঁস কোনো কথাও বলেনি পরীবানু। সেজন্য সাহস করে মশারির ভিতরে এক পাশে নিজের বালিশে শুয়েছে সুরুজ, অন্ধকারে দু'চোখ মেলে আছে।

ওপাশে জয়নাবও নিশ্চয় ঘুমায়নি, পরীবানুর গায়ে গা লাগিয়ে বিছানায় মিশে আছে, ধুক্‌পুক্‌ বুকে ভয়ে-ভয়ে তাকাচ্ছেও, হয়তো বা।

আশ্চর্য অবস্থা। এমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাবের মধ্যে শরীরের ভিতরে তড়িৎ প্রবাহ খেলে যাচ্ছে, কি করে যে কাটবে সারাটা রাত।

এমন এক সময় ছিলো, কিছুকাল আগেও, যখন পরীর শীতলতা ও বাধাপ্রদান উপেক্ষা করে সে ঘুমিয়ে গেলে উঠে পড়ত।

অতি সন্তর্পনে আস্তে-আস্তে অনেকক্ষণ ধরে ওর শিথিল শাড়ি ও সায়া খুলতো, জামার বোতাম খুলে আলগা করে দিত।

কিন্তু চুরি করে কদ্দুর এগুনো যায়? প্রায় প্রত্যেকবারই ও ধড়মড় করে জেগে উঠেছে;, একরাতে তো বুকে লাথি মেরে ফেলেছিল; নসিবের ফের, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্যটুকু পাচ্ছে না।

একবার হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যাবে অন্য একটি যুবতী নারী কাছে আছে এখন। তার উপর কি চেষ্টা করবে না ? না করাটা নেহাত বোকামী ঃ সেই রাতে তো প্রায় কাবু করে ফেলেছিল। যদি ওর কথা না শুনত তাহলেই জিতে যেত। বার-বার এমন নির্বুদ্ধিতা ঠিক নয়।

আস্তে-আস্তে উঠে বসে সুরুজ, তারপর মশারি উঁচিয়ে সতর্কভাবে নিচে নামল; বিজলি চমকাচ্ছে না,. এই এক সুবিধা, সে অন্ধকারে একপা দু'পা করে হেঁটে জয়নাবের কাছে এসে দাঁড়াল। রক্ত খেলা করছে মগজের কোষে-কোষে, একেকবার থর-থর করে উঠতে চাইছে ভিতরটা; কিন্তু সে যেনো অদৃশ্য এক বন্ধনে বন্দি। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আস্তে-আস্তে বসে পড়ল উবু হয়ে এবং ডান হাতটা মশারির নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে জয়নাবকে স্পর্শ করতে যায়, ধরতে চায়। কিন্তু অমন কাঁপছে কেন হাতটা ? শুধু হাত নয়, পা দু'টোও এবং অনুভব করে সারা শরীরটা, যেনো আলোড়িত, শিহরিত। নাহ্, এটা কাপরুষতা।

একবার চট করে হাতটা মশারির ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, ছুঁয়ে দেখে ওপাশ ফিরে পরীর সঙ্গে মিশে আছে; আস্তে-আস্তে, যেনো বিন্দু বিন্দু করে, বাজু ধরে টেনে চিৎ করে ফেলে। হ্যাঁ, জয়নাব ঘুমুচ্ছে তো। বাপের শুশ্রূষায় অনেকরাত জেগে-জেগে এখন অঝোর বর্ষণের তলে শীতল আবহাওয়ায় এটাই সম্ভব। হাঁটু গেড়ে বসেছে, পালঙ্কের ধারে বুক সমান যেন জেগে না ওঠে, মোলায়েম ভাবে হাতড়ে চলে মাথাভরতি চুল কপাল ঠোঁটজোড়া, নাকটা দু'আঙুলে একটুখানি টিপে দেখল। মসৃণ গলা, কিন্তু বুকের কাছে এসে এমন কাঁপতে থাকে স্থির করতে পারছে না। সরিয়ে আনে। কোমরের গুঁজে দেওয়া কাপড়ের পাড় আঙুলে টেনে টেনে খোলার পর দু'জানুর মাঝখানে তলপেটের উঁচোনো কোমল মাংসল জায়গাটায় যখন হাত দিল, তখন বাকি গতরটা শিউরে-শিউরে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ যেনো একটা ঝামটা মেরেই জয়নাব পাশ ঘুরে পরীবানুকে জড়িয়ে ধরে, ঘুমজড়ানো মগ্নস্বরে বলে উঠল, 'বুবাই বুবাই গো ! হুলা বিলাইডা খামছাইতাছে মনে অয় খুব ভুখ লাগছে—'

'তয় আমি কি করুম।' তেমনি মগ্নস্বরে পরীবানু বলে, 'তোর হাতের কাছে দ্যাখ নিচে খড়ম আছে শক্ত কইরা, মাথাৎ বারি দে।'

পায়ের কাছে গুটিয়ে রাখা কম্বলটা দু'জনের গায়ের উপরে টেনে নিল। তখন ওদিকে প্রায় উলঙ্গ ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

৫

এখন দুপুরের প্রখর রৌদ্রে বড় ঢেউ নেই, কিন্তু পুরো বর্ষার মেঘনার বিশাল জলরাশির দোলা ঠিকই আছে; বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্রের মোহনার কাছাকাছি ডিঙি ও ছই ঘাসি নৌকার এপার ওপার চলাচল বেশি বলে আলোড়নও কম নয়। উত্তরে ব্রীজের গার্ডারের ভিতর দিয়ে খচর-খচর করে ট্রেন চলে যাচ্ছে, এদিকে সরকারখানার চিমনিতে ধোঁয়া।

উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত চোখ ঘুরিয়ে এক নজর তাকিয়ে দেখে দৃশ্যপট; একটা ছোট জাহাজ সিটি দিয়ে চলে গেল, বোধ হয় নারায়ণগঞ্জের দিকে; রুছমত নদীর তলদেশে পোঁতা বরাক বাঁশটার পানির নিচে একটা গীঁটে দড়ি পেঁচিয়ে বাঁধে ডিঙিটা, মোচার খোলার মত উঠছে, ভাসছে। বর্ষার পানিতে ডুবে গেছে বলে বোঝা যায় না, এ জায়গাটা পাড়ের পরে একটু ঢালু, যা ক্রমান্বয়ে মূলখাতের দিকে চলে গেছে। এখানে তার তিনটা চাঁই, খুটি দিয়ে পাতা, পাশাপাশি। হালকা কাপড়ে পুঁটলি বেঁধে ময়দার আধার দেওয়া আছে। খালুর কাছে শুনেছে, কাছারির বাবুরা বলতেন গলদা চিংড়ি, এরা বলে কুশিয়ারী ইছা; এ পর্যন্ত বড় কোনো ঝাঁক পড়েনি, কিন্তু দু'বারে পেয়েছে ডজন খানেক।

আজ সকালে বাইরে পাকাল জ্বালিয়ে জয়নাব বাপের জন্য বার্লি পাক করছিল, সে সময় রুছমত ইয়াকুব মাঝির কাছে ছিল। পানিতে ডুবিয়ে-ডুবিয়ে পাট কাটা অনেকটা এগিয়েছে, বিশ্রাম নেয়ার সময়টায় মাঝখানে দেখতে এসেছে।

এখন ইয়াকুব মাঝি অনেকটা সুস্থ; বিছানায় উঠে বসেছে, রুছমতের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'বাজারে কুইশ্যারি ইছাটিছা উডে না? কি যে জিব্বা আমার, অসুখে খারাপ অইয়া গেছে।'

রুছমত বলল, 'না খালু ঐ সময়টায় মাছটাছ পাওয়া যায় না। পানি বেশি তো। পানিতে টান ধরলে মাছ ধরা পড়ে—'

'হেইড্যা কি আর জানি না? জানি তো, হুতা নাই জাল নাই, জাওলারা নির্বংশ অইয়া যাইতাছে। এই তো, আমরার সামনের গেরাম, পঞ্চবড়িতে বিশঘর জাওলা আছিল, তারা কই? কিছু গ্যাছে ইন্ডিয়া, কিছু মরছে। অহন আছে দুই ঘর, জগদীশরা আর যতীনরা। আর যা মাছ মারে! শহরেই সব চালান দিয়া দেয়। আমরা মাছের মুখ দেহি না—'

একটু ভেবে রুছমত বলল, 'ভালা কথা খালু, দুই সপ্তাহ আইয়া গ্যাছে গা আমার চাঁই তুলি না। আমি যাই। আপনের কিছমত ভালা অইলে কুইশ্যারি ইছা পাইয়া যাইয়াম—' এদিক থেকে জয়নাব কান খাড়া করে রেখেছিল, রুছমত টিকা ধরাতে এলে বলল, 'রুছমত ভাই! গাঙের পানি তো অহন বেশি, অত পানিতে তুমি বুর দিবা চাঁই তোলনের লাইগ্যা?'

খলখল করে হাসল রুছমত, 'বলল, 'বেশি পানিৎ বুর দিতেই তো মজা! তোমার ডর লাগতাছে বুঝি?'

'বিপদের সময়ই বিপদ আইয়ে, ডর লাগবো না?'

'আরে কোনো ডর নাই, তোমার দোয়া থাকলে পাতালে আমি আজরের খাইরেও যাইতাম পারি!'

আজর রহস্যময় জলদেবতা, তাঁর গল্পগাথা অনেক শুনেছে। আদমী পেলে ছাড়ে না। জয়নাব শিউরে উঠে বলল, 'অত বাহাদুরি দ্যাহাইও না রুছমত ভাই। একদিন পট্ কইরা—'

'গায়েব অইয়া যাইমু গা তাই না?'

'অসম্ভব কি, হুনছি বেশি পানির সময় কুমিরটুমির ও এদিহে আইয়ে। ফইখরার চরে তো আগের দিনের কুমীর উইঠ্যা রইদ পোহাইতো।'

কলকেতে জ্বালানো টিকায় ফুঁ দিতে-দিতে রুছমত বলেছিল, 'আমরা চাষাভূষা লোক, আল্লাহর দেওয়ায় জানডাই সম্বল। যায় জুদি একদম খতম। তবু অত ভাবলে তো চলবো না—ঝড়, তুফান, কলেরা, বসন্ত, কুমির আজর আছে, আর থাকবোও। আমরা কাম কইরা যাইয়াম।'

জয়নাব উপলব্ধি করে, কথা শুনবে না। সে মুখ তুলে তাকাল তারপর বলল, 'বিসমিল্লাহ্ কইরা বুর দিও আর সুরা ইয়াসিন পইড়ো, তাইলে বিপদ অইবো না।'

রুছমত ডাবার ছিদ্রে একটা ফুঁ দিয়ে দাঁড়িয়ে দু'একটা টান দিল, তারপর বলল, 'জয়নাব! তোমারে তো কাছে পাই না। যখন পাই, মানুষ থাহে। দু'একটা কথা আছিল কওন দরকার।'

'হ, রুছমত ভাই আমরাও কিছু কথা আছে।' জয়নাব পাকালের উপর থেকে লুছন দিয়ে ধরে এলুমিনিয়ামের ছোট পাতিলটা নামালো, ওর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম; সে বলল, 'তোমার মনিবের তো অনেক আউস—!'

আবার গাঙে নামতে হবে বলে ভেজা লুঙ্গি পরনে রেখেই রুছমত এসেছিল, ওর যাওয়ার সময় তা চোখে পড়লে বিষণ্ণতার ছায়া নামে জয়নাবের চেহারায়। ভৈরব বাজারের হলে তিনবার সিনেমায় গিয়েছে, ছবিতে তো আছেই এমনিতেও জীবনের রঙচঙ কিছু দেখেছে। অথচ এই চলাফেরার কত পার্থক্য। আঁচলের প্রান্তে মুখটা মুছে ও যখন উঠে দাঁড়ালো তখন মনে হঠাৎ করে ভেসে উঠল কয়েকটা মুখ, কিছু দৃশ্য ও ঘটনা। রুছমত, সুরুজ মিঞা, সান্নামত। হ্যাঁ, সান্নামতও; সে রাতে ওর দৃঢ় বিশ্বাস, নবী মোল্লার এই ডাকাত পোলাটাও এসেছিল, বরং সেই ছিলো লিডার; এবং উদ্দেশ্য, আর কি? জয়নাবকে অপহরণ। গরিবের মেয়ে তো? তার আর দাম কত?

পুলিশও জানে সশস্ত্র, কিন্তু ধরতে পারে না, আর সবাই ভয় করে সুযোগে সান্নামত বাপের সঙ্গে কতবার খাতির জমাতে চেয়েছে।

সে বাড়িতে পারা দিলে পাছদোরা দিয়ে পালিয়ে চলে যেত ওই বাড়িতে পরীবানুর কাছে। কিন্তু একদিন খপ্ করে হাত ধরে ফেলেছিল, 'জয়নাব তোরে আমি চাই। যে জুইতের মাগি অইছস্ তোরে কচ্‌কচ্ কইরা না খাইলে আমার শান্তি নাই। এই ল একশ' ট্যাহা। রাইতে আইয়াম আমি। বুইড়া-বুড়িরে পাছাৎ লাথি মাইরা বাইর কইরা দিমু—আমরা অহন জোয়ান, ফুর্তিফার্তা করুম না?'

সে রাতে বাসায় ছিল না। কিন্তু সান্নামত, কুমতলব ছাড়েনি—সে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো যেভাবে ঢুঁশ মেরে আসে তা রীতিমত বিপজ্জনক। একটু রক্ষা এই, শহরে বন্দরে দূরবর্তী এলাকায় তার গতিবিধি—এদিকে আসামাত্র জয়নাবের জন্য তার রোখ চেপে যায়। জানোয়ার একটা আস্ত জানোয়ার। সুরুজ মিঞার চাইতে মারাত্মক।

যেন একটা জঙ্গলে আছে; চার পাশের এই সমস্ত পশুদের লোমশ থাবা থেকে কতদিন আর আত্মরক্ষা করতে পারবে তাই আসল ভাবনা। গরিবের মেয়ে আছে, গরিবের বৌ হলেও বিপদ কমবে না।

বরতনে বার্লি ঢেলে বাপকে খাওয়াবার সময় জয়নাব চুপচাপ, ওর মনের ভিতরে তখন এক স্বপ্নিল জোয়ার চলেছে; ক্রমে রুহুমতের অবয়ব সেখান থেকে মুছে যেতে থাকে এবং তার জায়গায় জাগে স্বাস্থ্যবান উচ্ছল যুবকের মূর্তি—সে সবুজ মিঞা, কবি আবু ফয়সল। বাড়ির কাজের বৌটির কন্যা এবং পড়শি, কিন্তু কিইবা ছিল! অথচ খেলাচ্ছলেই যেনো তার সঙ্গে চারপাশের লোকচক্ষুর অন্তরালে একটা গভীর গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একি মাদকতা, একি আশ্চর্য রূপান্তর! ছোটবেলা থেকেই মিশেছে রুহুমতের সঙ্গে, কৈশোরকালের কতো স্মৃতি, কতো কল্পনা, কিন্তু এই সম্পর্কের প্রকৃতিই সম্পূর্ণ আলাদা। নয়নে নয়ন মিলিয়ে যেন চেয়ে থাকতে পারে অনন্তকাল। প্রথম ছোঁয়ায় কেমন মদির শিহরণ জেগেছিল এবং যখন এখন এক দুপুর বেলায় বুকের উপর দিয়ে দু'হাতে ঠোঁটে চুম্বন করল, তখন এক স্বর্গীয় আনন্দের উৎসরণ। বসন্তকালীন কবিতা উৎসব সন্ধ্যার পর থেকেই প্রকৃত শুরু, সবাইকে বিদায় করে দিয়ে বাংলা ঘরের ছোট কামরায় শুয়ে পড়েছিলো। এক গেলাস পানি নিয়ে যায়; এক চুমুকে খেয়ে দু'হাতে ওর হাত ধরল। ব্যাপারটা এমনই স্বাভাবিক ও অনায়াস, কিছু মনে করার কারণ ছিলো না। উচ্ছ্বাসভরে ফয়সল বলল, 'জয়া! আগে বুঝতে পারিনি তুই দেখি আশ্চর্য সুন্দর। শ্যামলা রঙ, ডাগর-ডাগর চোখ, মেঘের মতো চুল! বাইরে এমনটি কোথাও দেখিনি। তোর জন্য কবিতা লিখবো, তুই আমার কবিতা!'

এসব কথা কি বুঝবার ক্ষমতা ছিল জয়নাবের, তবু প্রায় সবই বুঝেছিল ঃ সাবালিকা নারীর কাছে পুরুষের চেহারাটাই শ্রেষ্ঠ আয়না, তা দেখামাত্র স্বাভাবিক অনুভব শক্তিতে সঙ্গে-সঙ্গে সে সব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

জয়নাব হাতটা ছাড়িয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'হুনছি কবিরা পাগল—আপনেও একটা পাগল!'

'তা বল, রাগ করবো না। কিন্তু আমার মনে হয়, এক অর্থে তা সত্যি। আসলে পাগলামী ছাড়া সৃষ্টি হয় না।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে উঠেছিল, 'তোকে দেখে একটা অদ্ভুত কথা আমার মনে জেগেছে—'

'কি? কন না হুনি।'

'আমার মনে হচ্ছে, বাংলার সোনা মাটি ফুঁড়ে তুই বেরিয়েছিস্—তুই মাটির দুলালী। এই মাটির সব উর্বরতা তোর শরীর ভরে আছে!

তুই অনেক বড় হতে পারিস্ অনেক বড়। একজন ফোরেন্স নাইটিঙ্গেল, একজন মাদাম কুরী। একটু শুধু সুযোগ চাই।' আবু ফয়সল ওর একটা হাত আবেগ ভরে চেপে ধরেছিল, বলেছিল, 'তোর মধ্যে আছে একটা আদিম পবিত্রতা, অসীম সম্ভাবনা। ঠিক আছে, কালকেই বই কিনে আনবো। আমি তোকে পড়াবো—'

'আমিও আপনের কাছে পড়ুম্।' জয়নাব প্রথমে খুশিতে ঝল্‌মল্ করে ওঠে তারপর মুখ ভার করে বলেছিল, 'আপনে তো পাশ কইরা শহরে যাইবেন গা, তহন আমার কথা মনে থাকবো?'

'কি যে বলিস্! আমি শহরে গেলেও আমার প্রাণটা তোর কাছে পড়ে থাকবে! জয়নাব তুমি আমার কবিতা, আমার প্রিয়া।'

'ইমুন কইরা কইয়েন না, আমার কান্দন আইয়ে যে!' বলতে বলতে সত্যি সত্যি চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছিল। ফয়সল উঠে দাঁড়িয়ে রুমালে চোখ মোছে ওর। আরো কত ছোটখাট ব্যবহার। এসবই মনের পরতে-পরতে গাঁথা হয়ে আছে; সে লুকিয়ে রেখেছে সেগুলোকে, ঘুনাক্ষরেও কাউকে আভাস দেয় না, এমনকি নিজের কাছেও শুধু একান্তে গুঞ্জন করার টুকরো-টুকরো সুর। সবচেয়ে মধুময় স্মৃতি তখনি এমনি বর্ষার এক রাতে যখন স্থির মেঘের আস্তরনের আড়ালে ছিল চাঁদ, চুপিচুপি বেরিয়ে পড়েছিল ওরা দু'জনঃ গাছতলায় বাঁধা কেরায় ডিঙিটা খুলে নিয়ে নিঃশব্দে লগি ফেলে বাইতে শুরু করেছিল আবু ফয়সল। লেখাপড়ার জগতে আছে তবু এসব বিষয়ে ওস্তাদ। মনে হলো তাই। আচ্ছা জোৎস্নার ছায়া পড়েছে একদম কাছে না গেলে কাউকে চিনবার জো ছিলো না তবু জলদি-জলদি বডিং এলাকা ছেড়ে এল মসজিদ ঘাট বাঁয়ে রেখে যখন মোহনার দিকে চলে তখন হাতে বৈঠা, এবং ছইয়ের ভিতরে মাথায় কাপড় দিয়ে ঘাপটি মেরে বসে জয়নাব। বুকের ভিতরটা ওর চিরচির করছিল। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সাহায্য করে, কিন্তু কি করে সম্ভব? কারুর চোখে পড়লে সন্দেহ করতে পারে। রাইস মিলের জায়গাটা পিছনে ফেলে মোহনা ছাড়িয়ে মেঘনায় পড়লে দক্ষিণা বাতাস লাগল। একটা মোচড় খেয়ে ঘুরে যায় ডিঙিটা, তারপর উত্তর দিকে ভেসে-ভেসে চলে।

অনেকক্ষণ একটানা বৈঠা মেরে কাহিল হয়ে পড়েছিল, ঘামে শার্টের পিঠ ভিজে গেছে, ফয়সল আর বাইতে পারে না। সে স্থির হয়ে বসল নৌকার রোখ্ ঠিক রাখবার জন্য বৈঠার উপরাংশ কিছুটা ডান বগলের ভিতরে চেপে পা জোড়া লম্বা করে দেয় সামনের দিকে।

পাল ছিলোনা তবু বয়ে যাওয়া হালকা হাওয়ার চাপে ডিঙিটা এগিয়ে চলেছে মাঝ গাঙ দিয়ে। কিছু-কিছু আলো আছে। বাঁদিকে ভৈরব-বাজার ডানদিকে আশুগঞ্জ বিশ্ব গুদামের শাদা শরীরটা দেখা যাচ্ছিল।

এদিক ওদিক ছোটো বড় নৌকা আছে; লোকজনেরও নড়াচড়া। তবু কেমন একটা নির্জনতা বিচ্ছিন্নতা। জয়নাব ভিতর থেকে উঠে কাছে এলে ওকে কোলের উপরে নেয় আবু ফয়সল, বৈঠাটা তুলে রেখে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিল। ডিঙিটা ব্রীজের নিচে এসে গেছে, একটা পায়ার সঙ্গে আড়াআড়িভাবে ঠেকেছে।

ফয়সল কানের কাছে ঠোঁট দিয়ে গুণগুণ করে গায়, 'তুমি যে আমার কবিতা'—জয়নাব ঘুরে ওর ওপরে উপুড় হল এখন ঠোঁটের কাছে ঠোঁট জোড়া সে আস্তে করে বলল, 'আপনারে তো আমি পাইতাম না।'

'এই তো পেয়েছ মণি। আর পাওয়া কি! এভাবে যুগ-যুগ আমরা ভেসে চলতে পারি।'

'মাইনষে খারাপ কইবো যে?'

'ভালো জিনিশ মাত্রই মানুষের চোখে খারাপ।' আবছা আলোকে হাতের তালুতে ওর দুই গাল চেয়ে ধরে তাকিয়ে ফয়সল বলল, 'তোকে যদি বিয়ে করি? তাহলে তো আর কেউ কিছু বলতে পারবে না?'

হঠাৎ জয়নাব ওকে জাপটে ধরে বুকে মুখ লুকাল। ফয়সল উঠে বসে এবং ওকে কোলের উপরে আড়াআড়ি ভাবে নিয়ে ঘাড়ের নিচে হাত রেখে ওপরে তোলে ওর মুখটা নিজের মুখের কাছে, জয়নাবও গলা জড়ায়। একটি গভীর নিবিড় চুম্বনে দু'জনে আকুলি-বিকুলি করে নিঃশেষে কি পান করতে চায়। সবটুকু যেন এখন পাচ্ছে না। মাথার উপর দিয়ে শব্দের ঝড় তুলে একটা ট্রেন চলে গেল। কতক্ষণ, আরো কতক্ষণ? নদীর স্রোত বয়ে চলেছে, সময় বয়ে চলেছে; ওদের খেয়াল নেই।

এক সময় ফয়সল বললো, 'চল যাই নাওয়ের ভিতরে।'

জয়নাব আপত্তি করে না। চুলের খোপা খুলে গেছে, সিথিল বসন। দ্রিমিদ্রিমি উত্তেজনায় যুবতী বাঘিনীর মতো কাঁপছে। ভিতরে এসে নিজেই কোলে উঠে বসলো, এবং দু'হাতে আবার গলা জড়িয়ে চুম্বনে মিশে যেতে, হারিয়ে যেতে থাকে। এইভাবে আরো কতক্ষণ চলে যায়, বলতে পারবে না। এক সময় ঠোঁট ছাড়িয়ে জয়নাব ফিসফিস করে বললো, 'আমারে ছাইড়া যাইবেন না তো?'

আচ্ছন্ন, সুস্থির ফয়সল; যেনো স্বপ্নের ভিতর থেকে উচ্চারণ করে, 'পাগলি।'

সে বুকের মাঝে হাত দেয়, তখন জয়নাব বুকের কাপড় আলগা করে দিয়ে ডানহাতে ডানস্তনের গোছা চেপে ধরে স্তনের বোটাটা ওর মুখের মধ্যে এগিয়ে দেয়। ভীষণ আকুবাকু করছে, যেনো কাতরাচ্ছে অজানা এক যন্ত্রণায়, ফয়সল হঠাৎ ওকে পাটাতনে ফেলে পাগলের মতো কাপড় টেনে চিতিয়ে ফেললো। জয়নাব জানু চেপে রাখে এবং দুই হাতে বাধা দেয়, অনুচ্চস্বরে বললো, 'নানা লক্ষ্মী মনা, এইড্যা না। বিয়ার আগে এইসব করে না, গুণা অইব।'

সে রাতে নৌকা চালিয়ে দুপুর রাত শেষ হওয়ার আগে ফিরে এসেছিল এবং গাছের নিচে আবার কিছুক্ষণ দু'জনে জড়িয়ে থাকার পর, নিঃশব্দে পা ফেলে যে যার ঘরে চলে যায়।

কেন এমন হলো ? সে তো চায়নি কিছুই, প্রথম দিকে বুঝতে পারেনি। একটা অদৃশ্য শক্তির লীলার মধ্যে অজান্তে ধরা পড়ে গেছে। যা হবার হোক, সব আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

বাপকে বার্লি খাইয়ে বারান্দায় একটা জলচৌকি পেতে বসালো, আদর করে বলল, 'বইয়া-বইয়া একটু জিরাও, আমি বুবাইরের কাছে যাই, আমার লাইগ্যা বোধ হয় প্যাচাল পারতাছে—'

'ঠিক আছে যা মা। ওরা যা করছে, তার দাদ আমি দিতে পারুম না। যা ফুটফরমাইশ দেয় ভালো মত করিস—'

'রুছমত ভাই মাছ লইয়া আইলে খবর দিও !'

'আর মাছ ! কুইশ্যারি ইছা পাওয়া অতোই সোজা ? আজকাল মাছ সব পলাইছে ভাডির দিকে। কি করবো, কারখানার বিষাক্ত ময়লা গাঙে মিশতাছে। এইতো বৈশাখ মাসে অনেক মাছ মইরা ভাইস্যা উঠছিল।'

'আইচ্ছা, বাজান।' কি বলতে গিয়ে থেমে যায় জয়নাব, পায়ের বুড়ো আঙুলে বারান্দার মাটি খোঁচায়।

'কস না কি কইবি। আল্লাহ্‌ তো এইবার বাঁচাইয়া দিছে, কিন্তুক শরীলডা যে কবে পুরা ভালা অইব। কামকাইজ না করলে চলবো ক্যান। ক, কি কইবি তুই।'

কাছে বসে জয়নাব, আস্তে-আস্তে বলল, 'আমারে তোমার আর ভালো লাগে না ?'

'কি যে কস্‌ পাগলি মাইয়া, ভালা লাগবেনা ক্যারে ?'

'মনে তো অয়, লাগেনা।' গাল ফুলিয়ে বলল জয়নাব, 'নাইলে আমারে দূরে তাড়াইয়া দিবার চাও ?'

'দূরে কইরে ?' হঠাৎ কি মনে পড়তে তেতো মুখে হেসে উঠল ইয়াকুব, মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললো, 'ও বুঝছি, কিন্তু রুছমত আবার ঘরের ছাইলা। তুইতো আবার ঘরেই থাকবি।'

'না, বাজান। আমি যেমন আছি, তেমনই থাহুম। আমি লেহা-পড়া করুম, তারপর শহরে যাইয়াম।'

'হা হা হা, পাগলি কি কয়।' এবার হেলেদুলে হাসতে থাকে ইয়াকুব, এরপর থেমে বলল, 'আমরা মনিমজুর, আমাগো কপালে কি বিদ্যাশিক্ষা আছে রে! এদেশে বড়লোকের পোলাপানরাই খালি লেহাপড়া করার সুযোগ পায়। সুযোগ থাকলে তো এদ্দিনে তুই মিটিক দিতি। গায়ে গতরে খাইট্যা প্যাডের জালাই দূর অয় না!'

'না, বাজান আজকাল মায়া মাইন্‌ষেরাও—'

'বুঝ্‌ছি বুঝ্‌ছি, সবুজ তোরে খ্যাপাইছে। হুনছি, হে নাকি কবি লেখে! কবিরা তো কতো কথাই কয়। যা' যা আমার গলাডা খুব পিতলা-পিতলা করতাছে—এক ছুলুম তামুক সাইজ্যা আন্‌—'

'আগে করার কর, আমারে অহন বিয়া দিবা না?'

'পাগলি রে বিয়া শাদিৎ মাইন্‌ষের আত নাই—আল্লাহ কলম মাইরা রাখছে, যেহানে যহন অইবার অইয়া যাইবোগা। আমি কি আর থামাইয়া রাখতে পারুম? আমার কতো দুশ্চিন্তা। ডরেভরে আছি কোন্‌ রাইতে সান্নামত আবার আইয়ে, তোরে ধাইরা লইয়া যায়—'

জয়নাব একটুখানি চুপ, তারপর আস্তে বলল, 'ধইরা লইয়া গিয়া মাইরা ফালাইলে ভালাই অইত বাজান। অত দুঃখ লইয়া বাঁইচ্যা লাভ কি?'

'তোর অত দুঃখ কিয়ের মা? সবে জীবনের শুরু। আমরা অনেক দুঃখের রাইত পার অইয়া আইছি। কতকিছু দেখলাম। লীগ কংগ্রেস। ইংরাজ রাজত্ব, পাকিস্তান। বিশ্বযুদ্ধ, রায়ট, দুর্ভিক্ষ। একাত্তর সালের যুদ্দু, আর অহন বাংলাদেশ। কত খুনখারাবি বলাৎকার আগুনে পোড়াপুড়ি তয় আল্লাহ্‌র কি কুদরত আমরা বাঁইচ্যা রইলাম। তোর একটা বিহিত করতে পারলে মনে শান্তি পাইতাম, সুখে মরতে পারতাম।'

জয়নাব বুঝতে পারে অনেক কাহিনী, অনেক ইতিহাস তার বুড়ো বাপটার বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে। ওর মুখে বেদনার ছায়া, সে বললো, 'আমার লাইগ্যা বেশি ভাইব্যো না বাজান। কপাল ভালা অইলে আমি ভালাই থাহুম্‌।'

পাকালের কাছে গিয়ে হুঁকোটা সাজিয়ে নিয়ে আসে জয়নাব, ইয়াকুব ঝুম্‌ ধরে বসে কন্যার ললাট-লিখন সম্পর্কেই যেন ভাবছিল। সে কাছে এলে পূর্ব কথার উত্তর দেয়, 'তোর কপাল আর কতো ভালা অইব, মা। পোড়া কপাইল্যার ঘরে জন্মাইছস্‌। আমার বাপ্‌ মজুর আছিল্‌, আর

আমি কেরায়া নাওয়ের মাঝি। তোরে আর কি সৈয়দবাড়ি, ভূঁইয়াবাড়ি, বেপাড়িবাড়ি, মিয়াবাড়িতে দিতে পারুম। কেউ নিব না। তাই ভাবতা-ছিলাম, গরিবের আতেই যহন তুইল্যা দিতে অইব, তহন—'

'রুছমত ভাই তো আমার খালাতো ভাই।' জয়নাব মুখ নিচু করে বলল, 'রক্তের সম্পর্কের লগে আবার সম্পর্ক, মাইনষে কয়, ভালা অয় না।'

এবার একটু যেন অবাকই হয় ইয়াকুব মাঝি, মেয়ের মুখের দিকে মনোযোগের সঙ্গে তাকায়; কারণ তার বদ্ধমূল ধারণা রুছমত-জয়নাব সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ঃ তারা একে অন্যকে মহব্বত করে, পিয়ার করে। মেয়ের উত্তরটা পছন্দ হলো না, জলদি বলে উঠল, 'বাজে কথা, বাজে কথা। আমাগো মইধ্যে, আত্মীয়স্বজনগর মইধ্যে বেশি বিয়া শাদি অয়। এই গেরামে বাড়ি বাড়ি, গইণ্যা-গইণ্যা দ্যাখ, কয়ডা নতুন সম্পর্ক।' জয়নাব আর শুনতে চাইলো না, একটা পা বাড়িয়ে বলল, 'আমি যাই বাজান।'

আমিরন, প্রায় সারারাত অকাতরে ঘুম দেওয়ার পর সকালে উঠে এ বাড়ির রান্না ঘরে এসে কাজে লেগেছিল, এখন হাঁড়ি পাতিলের ঠুনঠান্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বারান্দায় উঠে একটু দাঁড়ায় জয়নাব, দেখে পরীবানু পালঙ্কের এক ধারে জেওরের পোটলা খুলে বসেছে; কাছেই স্টিলের আলমারির দরোজা খোলা। চুল আঁচড়ায়নি, কাপড়ে চোপড়ে আলুথালু; কিন্তু যেন অনেকটা সুস্থ। মুখ তুলে তাকাতেই ওকে দেখতে পেয়ে বলল, 'জয়নাব! আয় ইদিকে। তোর বাপের অবস্থা কিমুন?'

কাছে চলে যায় জয়নাব, বলল, 'অহন একটু ভালা বুবাই। জ্বর ছাইড়া গেছেগা, তয় শরীলডা খুব দুর্বল।'

'চিন্তা করিস্ না, ভালা অইয়া যাইব গা।' পরীবানু শোনার বালা-জোড়াডা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বলল, 'অসুখ-বিসুখ তো সাময়িক ব্যাপার—দ্যাহস্ না, আমি আজকা কিমুন আছি?'

'হ, বুবাই, আপনেরে আজগা খুব ভালা লাগতাছে।' জয়নাব বলে সামনাসামনি হলে একটু হাসল পরীবানু।

'হুন, এই হানে ব।' হাতে ধরে ওকে বসাল, বলল, 'সবুজ মিঞা খবর পাডাইছে বাড়িৎ আইতাছে। আমি আজগা গোসল করুম, সারা শইলো ক্যাদা জইম্যা গেছে, তুই আমার পিঠটা মাইজ্যা দিবে লো?'

'দিমুনা ক্যান্ আইয়েন যাই কুয়ার পার।'

ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেহি তোর গলাডা।' পরীবানু তার পুরাতন সোনার মাদুলি ছড়াটা দু'হাতে তুলে ধরে বলল, 'আজকাল তো আলাদা ফ্যাশান, কত কারিকুরি। কিন্তুক আমাগো সময়ে এই গুলান কম কিছু আছিল না। দেহি তোর গলাৎ কিমুন লাগে।'

'আমারে ক্যান্‌ বুবাই!'

'রাখ্‌ রাখ্‌। পরীবানু ওর গলায় মাদুলি ছড়াটা পরিয়ে দিয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে, মধুর হেসে বলল, বাহ্‌ বাহ্‌ চমৎকার। তোরে যা লাগতাছে! ব্যাডা মাইন্‌ষে দেখলে দিওয়ানা অইয়া যাইব গা।'

'যাঃ বুবাই, আপনে যেন কি!' জয়নাব কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল, 'আপনের মতন সোন্দর তো আমি না। আগে আপনে আরো সোন্দর আছিলেন, না হুনছি, আপনেরে পাগল অইয়া বিয়া করছিলেন ভাইসাব—'

'ভাইসাবের নাম আর কইস্‌ না। পুরুষ মানুস বুইড়া অইলে গাড়ল অইয়া যায় গা।' হাসতে হাসতে বলল, 'মরে তো না। মরলে মনের মতন একটা মানুষ নিতাম।'

অবাক চোখে চুপচাপ তাকিয়ে আছে জয়নাব; নিজেও যেন জানে না, কি একটা অদ্ভুত খেয়ালের বশে ওকে অলঙ্কার দিয়ে সাজাল। গলায় হার, হাতে বুলি। বাজুতে বাজুবন্দ। কানে মাকড়ি, নাকে নাকফুল। সেকালের ঝলমলে সোনালিপাড় পাটের শাড়িটাও পরাল, তারপর ওর একটা হাত টেনে ধরে বলতে থাকে, 'পুঁথির গানডা মনে আছে লো? তা তোরা তো হুনস্‌ নাই। আমার মনে আছে। সহজে রূপের ভারে আপনি চলিতে পারে নবীন যৌবন তাহে ভার ঃ রূপের মুরারি বালি ক্ষেণে মইধ্যে পড়ে ঢলি কেমনে বহিবে অলঙ্কার। জয়নাব, তুই সেই রকম হি হি!'

'হুঃ, তোমার ভিতরে রত্ন আছে কাউরে বুঝতে দ্যাওনা।'

'আরে না না, বাপজানের একজন দোস্ত ছিলেন নিজাম বয়াতী। মাইঝে মাইঝে আইয়া উঠতেন, বগলে কিতাবের গাট্টি। হেইল্যা দুইল্যা, কি সোন্দর পুঁতি পড়তেন। কখনও বাঁশির সুর, কখনও ঠাডার আওয়াজ! খুব ভালো লাগতো—মাঝে মইধ্যে মনে পড়ে। এই কবিতাডা কোন কিতাবের না ও হ্যাঁ, মধুমালতীর। আরে হুন, রুছমইত্যা না গেছিলো মেঘনাৎ চাঁই তুলতে, অহনো আইলো না। আমারও কুইশ্যারি ইছার মগজ খাইতে ইচ্ছা অইতাছে খুব

অনবরত ছলাৎ ছলাৎ করছিলো ডিঙি, নিচে চলমান, স্রোতোধারা!

আশ্চর্য আজকে মেঘনার অথৈ পানিতে ডুব দিতে কেমন ভয়-ভয় লাগছে রুছমতের। সম্ভবত জয়নাবের মৃদু আপত্তিই প্রধান কারণ! অথচ কার জন্য। বিড়ার মইধ্যে করে আগুন এনেছিলো, মাঝামাঝি একটা গুড়ায় বসে ডাবাটা জ্বালে, তারপর তামাক খেতে থাকে ধোঁয়া ছেড়ে।

আসলে নামবার আগে কিছুটা দ্বিধা হয় সব সময়ই; কিন্তু একবার বুরে দিলে বেশ মৌতাত। তখন নিজেকে আর আদম মনে হয় না, মনে হয় এক প্রকার মাছ। কিংবা অন্য কোনো জলীয় জীব। হাতের পাঁচ হিশেবে সবসময়ই সে কোমড়ে বেঁধে চামড়ার খাপে পোরা একটা তুর্কি চাকু নিয়ে যায় বলা তো যায় না, চকচকে ধারালো দাঁত বার করে হাঙরও তো এসে আক্রমণ করতে পারে, সাগরের প্রাণী সাগরেই মানায় ওদের। সাগরে মিশেছে এমন সব নদীর নাকি একই পানি, একই অন্তঃপ্রবাহ; জোয়ারের সময় যদি উঠে আসে এরা, কিছছু করার নেই। একমাত্র উপায় হুঁশিয়ার থাকা, প্রয়োজন হলে, মোকাবেলা করার জন্য। পীরবদনের দোহাই মানে সাগর তুফান, কিন্তু আজর কি আছে কিংবা জলপরী অথচ ওদের নামে কত রূপকথা কল্পকাহিনী। জয়নাবের কাঁচামন, তার মধ্যে সবুজ আমের শাঁস জুড়ে সোঁদালো রসের মতো এগুলো জড়িয়ে আছে; ওর কাছে এগুলো সত্য বৈকি।

ভালোমত আঁটিয়ে নেংটি দিয়েছে, আঙুলে করে দুই কানের ছিদ্রে পানির ছোয়া দিতে দিতে বাতার কাছ থেকে মুখ তুলে তাকালো দূরে সুরুজ মিঞার বাড়ির দিকে। হ্যাঁ, একজন কে এসে দাঁড়িয়েছে। অস্পষ্ট ধোঁয়াটে। জয়নাব হবে নিশ্চয়ই।

জয়নাব, জয়নাব। একবার ঠোঁটে আউড়ে রুছমত ঝুপ্ করে পানিতে ঝাপ দিলো, তারপর উপুর হয়ে পাখার মত দু'হাত সঞ্চালন করতে করতে দ্রুত যেতে থাকে নদীর তলদেশের দিকে। এখানে পানির গভীরতা প্রায় আঠারো হাত। এত যে কামেল, তবু দু'মিনিটের বেশি তো দম রাখতে পারে না। তার মধ্যে একমিনিটের মতো নিচে পৌঁছতে লাগে কিছুক্ষণ বাঁধন জড়ানো অবশ্য চাঁই নিয়ে উপরে ওঠার সময় বিশেষ কষ্ট হয় না। দু'মিনিট, তিন মিনিট কিছু নয়—আত্ম-বিশ্বাসটাই আসল, আত্মবিশ্বাস অটুট থাকলে বুঝি দশমিনিটও কাজ করা যায় গভীর পানির নিচে।

মাটির কাছে, তলদেশে পৌঁছে একটানে খুঁটি থেকে আলগা করে ফেলে একটা তারপর পানিতে পা মারতে মারতে তড়িৎগতিতে উপরে উঠে ভেসে উঠল।

৬

পাটরানী! পাটরানী! জানো জয়া তুমি পাটরানী হয়ে গেছ! কিন্তু তোমাকে এমন করে সাজালো কে! এমন অপরূপ! দেখতে দেখতে আমি মরে যাবো!' বাংলা ঘরের কামরায় একলা পেয়ে সালংকরা জয়নাবকে আকুলভাবে জড়িয়ে ধরে আবু ফয়সল একটা দুরন্ত চুম্বনে পিষ্ট করে ঠোঁটজোড়া। জয়নাব সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল। যেতে যেতে একটু দাঁড়িয়ে বলল, 'একলা পাইলেই দুষ্টামি। ভিতর বাড়ীতে আইয়েন জলদি আপনের আম্মাজান অপেক্ষা করতাছেন।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি; কিন্তু আরো চাই।'

জয়নাব একটা কিল দেখিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

আপন মনে একবার হেসে ওঠে ফয়সল; ভাগ্য ভালো বাড়ীতে আসা মাত্র একবার পেয়ে গেছে। সূচনাটা শুভ।

এই তো কিছু আগে ভৈরব ইস্টিশনে এসে নেমেছিল, বাজার হয়ে আসার সময় মোহনার কাছাকাছি গাঙের মধ্যে রুছমতের সঙ্গে দেখা হল। বইপত্র কাগজভর্তি হ্যান্ডব্যাগটা পাটাতনে রেখেছে, সামনের দিকে ছইয়ের ধারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একটু দূর থেকেই দেখতে পায়, ডিঙিটা দুলছে; আর রুছমত ভেজা গতরে বসে হাঁপাচ্ছে।

আরো কাছে গেলে চোখে পড়ে দুই গুড়ার মাঝখানে দুটো চাঁই কিন্তু একেবারেই খালি।

কেরায়া ডিঙিতে, ফয়সলকে চেনামাত্র রুছমত উঠে দাঁড়াল এবং ডান হাতটা উঁচিয়ে বলল, 'সালেমালাইকুম—!'

'রুছমত! কি করছ এখানে?'

'এইতো চাঁই তুললাম; কিন্তুক একটা মাছও নাই, এই দুইড্যা ফাঁক পাইলাম। আরেকটা আছে।'

'এখানে পানি কত ?'

রুছমত মাথা চুলকিয়ে বলল, 'কি জানি। মনে হয় কুড়ি চল্লিশ হাত অইবো।'

'কুড়ি থেকে চল্লিশ !' হাহা করে হেসে ওঠে ফয়সল, বলল, 'ভালোই গণনা শিখেছো দেখছি। মনে হচ্ছে আমার কিসমত খারাপ।'

'কিসমত খারাপ আপনের না, আমার—' ডিঙিটা যখন ছাড়িয়ে যাচ্ছে রুছমত বলেছিল, 'কুইশ্যারি একটাও জুদি পাইতাম। আল্লাহ আল্লাহ করছি, দেহি তিন নম্বরডা ঃ এডাতেও না থাকলে—কি আর করুম !

'জলদি বাড়ি চলে এসো, কাজ আছে।' উত্তর পশ্চিমে মোড় নিয়ে নৌকাটা দুলতে দুলতে চলতে থাকলে ফয়সল গাছ-গাছড়ার আড়ালে পড়া নিজেদের বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। একটু আগে সাফল্যের আনন্দে ভেতরটা দুলতে থাকে ওর কিন্তু এক্ষুনি মায়ের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি ব্যাগের জিপটা একটানে খুলে ভিতর থেকে একটা এ্যালবাম টেনে বার করে সেটা হাতে নিয়ে ভিতরবাড়ির দিকে ছুটল। দরজা পেরিয়ে উঠোনে নামবার সময়েই ডাকতে থাকে, মা ! মাগো !'

কিছুক্ষণ আগে গোসল সেরে এসেছে, জয়নাব দৌড়ে কাছে গিয়ে খবর দিলে মাথা আঁচড়াচ্ছিল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে; এখন ছেলের গলা শোনামাত্র তাড়াতাড়ি দরোজার কাছে এলো। একমাত্র সন্তান, দু'চোখের মণি। ওকে ঘিরেই সব আশা-ভরসা, এ পর্যন্ত ওর গায়ে ফুলের টোকাটাও পড়তে দেয়নি।

আসছে দেখে পরীবানু উচ্চারণ করল, 'সবুজ ! তুই এসেছিস্ বাবা ?'

'হ্যাঁ মা।' মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে জিগগেস করলো, 'তুমি কেমন আছো।'

'ভালোই বাবা—কিন্তু তোর ভাবনাই ভাবছিলাম।'

মায়ের হাত ধরে পালঙ্কের কাছে যায়, বসতে বসতে বলল, 'জানো মা ? ইউনিভারসিটিতে আবার গোলমাল শুরু হয়েছে। আমি তোমার কাছে চলে এলাম !'

'বেশ করেছিস্ বাবা, তোর কাছেই তো আমার পরানডা পইড়া থাহে।' পরীবানুর চোখের কোণে অশ্রু, শাড়ির খুঁটে তা মুছে বললো, 'তবু কি করুম্ লেহাপড়া তো করতে অইব। আমারে জলদি ঢাহাৎ লইয়া যা, নিজের বাসাৎ আমার লগে থাকবি তুই। হল ছাইড়া দিবি।'

'ঠিক আছে মা, তাই ভালো হবে। প্রায়ই এদিক ওদিক গুলীর আওয়াজ পাই, আমার ভালো লাগে না।' হঠাৎ কি মনে পড়তেই ফয়সল

সোৎসাহে বলল, 'একটা ভালো জিনিশ দেখাবো তোমাকে মা, বল খুশি হবে ?'

'না দেখেই খুশী ? দেখা না কি জিনিশ।'

'এই দ্যাখ, সিম্‌পলি ওয়াণ্ডারফুল—মানে আশ্চর্যজনক ! মাঝারি সাইজের এ্যালবামটা, তার প্রথম পাতায় কর্ণার দিয়ে লাগানো একটা মেয়ের বর্ণবহুল মুখচ্ছবি। ফয়সল হাসল তারপর বলল, 'চিনতে পারছো না তো ? তা পারবে না।' এ হচ্ছে জয়নাব, আমাদের জয়নাব !'

'জয়নাব !'

'হ্যাঁ জয়নাব ! সেই যে আমার বন্ধুকে এনে ছবি তুলেছিলাম মনে নেই তোমার

'আছে তো !'

'সেই ছবি এগুলো ; দ্যাখ এর নিচে কি লেখা আছে ! লেখা আছে পাটরানী, দি জুট্ কুইন ! জয়নাব এখন আর গ্রামের ক্ষুদ্র বালিকা নয় সে আর তোমার কোমর টিপবে না। জাতীয় জুট করপোরেশন এই সমস্ত রঙিন ছবি দিয়ে ক্যালেন্ডার তৈরী করছে, ব্রোসিওর ছাপছে। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে যাবে—টোকিও-ম্যানিলা, মস্কো পিকিং লন্ডন প্যারিস, দিল্লী-ওয়াশিংটন। গলায় সোনালি আঁশের গোছা—এই ছবি দেখে পাগল হয়ে যাবে সব। সে জন্যই আমার ভয় হচ্ছে—'

'ভয় আবার কিসের !' পরীবানু এলবামের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'এতো—

ভয় কিসের জানো মা ? দূর থেকে যদি দাওয়াত আসে একজিবিশনে দেখা দেওয়ার জন্য। তাহলে ওকে যেতে হবে।'

'তাহলে তো আরো ভালো, তুই ওকে নিয়ে যাবি!'

'আমি নিয়ে যাবো ফয়সল সোল্লাসে বলল, 'তাহলে তো ভালোই। খুব মজা হবে।'

'ও জয়নাব ! জয়নাব কইলা পরীবানু ডাকতে-ডাকতে বলল, 'জলদি আয় লো, জলদি আয়। দেইখ্যা যা কি কাণ্ড।'

জয়নাব দুরু দুরু বুকে রান্নাঘরের কপাটের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো ; আমিরুন ওকে ঠ্যালা দিয়ে বলল, 'বিবিসাব ডাকতাছে যাস্ না।'

'আমার শরম করে না ?' জয়নাব বলল, এই জেওর খুইল্যা ফালাই।'

আমিরন বলল, 'তাইলে বিবিসাব খুব রাগ করবো। তোরে আউস কইরা পড়াইছে, এই জন্মে কি আর পাইবি লো। সাধ মিডাইয়া ল।'

জয়নাব মৃদু পায়ে চৌকাঠ পেরিয়ে এদিকে এলো, বলল, 'আমারে ডাকতাছেন।'

'জয়নাব! দ্যাখ্ দ্যাখ্। পরীবানু ব্যতিব্যস্ত, এ্যালবামটা ওর সামনে, বলতে থাকে, 'এইসব তোর ছবি। কি সোন্দর উঠ্ছে! তোরে চিনাই যায় না। ও আমিরন। চুলার কাছে কি কর, দৌড়াইয়া আও। তোমা'গো কপাল খুইল্যা গ্যাছে গা। জয়নাবরে দেশ-বিদেশ থাইক্যা ডাকবো, ট্যাহা পইস্যা তো পাইবোই—আর বহুৎ সরমান!'

ওরা সবাই যখন রঙিন ছবিগুলো দেখছে, তখন ফয়সল, কখনো হাত ছুঁড়ে, কখনো মাথা উঁচু করে একলা-একলা বকর বকর করে বলল, 'মধ্যযুগের পর্যটকরা বাংলাদেশকে বলেছে স্বর্গের দরোজা। কথাটা মিথ্যা ছিলো না। আমাদের সব এখনো আছে। শুধু মাটির নিচে নয়, মাটির উপরেও আমাদের রত্নভান্ডার। শুধু পাট। শুধু পাট দিয়েই আমরা দুনিয়া জয় করতে পারি। সিনথেটিক ফাইফার? ফোম পাটের কাছে নস্যি। দুধের সাধ গোলে মেটানো যায় না। তবু কিছু সমস্যা। তার জন্য আমরাই দায়ী। পাটের রূপকে আমরা তুলে ধরতে পারিনি, এবং ঐশ্বর্যকেও না। এখনই সময়। আইডিয়াটা আমার মাথায় এসেছিলো। আমার দোস্তের হাতে জাদু আছে, অবিস্মরণীয় ছবি তুলেছে, পাটরানী, সত্যই পাটরানী। তার দিগ্‌বিজয়ের অশ্ব ছুটে চলবে এখন, কেউ তার গতি রোধ করতে পারবে না। দেখে নিও—তোমরা দেখে নিও—'

কেরায়া নৌকা ঘাটের কাছ দিয়ে আসার সময় ওখানে যারা ছিলো সবাই দেখেছিল কবি আবু ফয়সল যাচ্ছে বাড়ি। বিশেষ করে বালক তরুণ ও ছেলেমেয়েরা খুব খুশি হয়েছিল: বসন্তকালীন কবিতা পাঠের আসরটির কথা এখনো ভুলতে পারেনি। ক্রমে ক্রমে ওরা এসে ভিড় করে উঠোনে, বারান্দায়: এমনকি ঘরের ভিতরেও। এ বাড়িটি সহজে কেউ মাড়ায় না, কি জানি কি কারণে; কিন্তু আজকে চারদিকে যেনো ফুলঝুড়ি, নানা কিসিমের ফুলের বাহার।

পরীবানু বারান্দায় এসে এ্যালবামটা উঁচিয়ে ধরে বলল, 'আমরার সৌভাগ্য। পাটরানী অইছে, জয়নাব।'

ছোট বড় সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে, কি ব্যাপার বুঝতে পারেনা। আবু ফয়সল মায়ের হাত থেকে নিয়ে এ্যালবামের প্রথম পাতাটা মেলে

ধরলো। জোরে জোরে বলতে লাগল, 'ভাইসব! এটা আমাদের গ্রামীণ মেয়ে জয়নাবের ছবি। সে পাটরানী নির্বাচিত হয়েছে। সারা দুনিয়ায় এই ছবি ছড়িয়ে যাবে—এটা আমাদের গৌরব। তোমরা দ্যাখ, সবাই দ্যাখ—'

'খালি ছবি না আমরা জয়নাবরে দেহুম জয়নাবরে দেহুম।' একদল ছেলেপেলে হইচই করে বলল, 'জয়নাবরে আনেন। আমাগো সামনে খাড়া করান।' পরীবানুর পিছনে ছিলো, পরীবানু ওকে ধরে সামনের দিকে নিয়ে এল। প্রথমে লজ্জাবনত ছিলো, অনেক মানুষের গুঞ্জনের মাঝ খানে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল; সারামুখে একটা অদম্য আত্মগরিমা। কয়েকজন শ্লোগান দিতে লাগলো, পাটরানী! পাটরানী

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় অন্য একদল, 'জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!'

একটা নির্জলা তামাশা ছাড়া কিছু না, সব যখন শুকিয়ে যায় এমন কেল্লাপা মাতামাতির প্রয়োজন আছে বোধহয়। কি এক খেয়াল চেপেছে পরীবানুর মাথায় নিজের প্রথম বধূ জীবনের অলঙ্কার ও তোলা কাপড় পরিয়েই ক্ষান্ত হলো না, বিকেলের আশ্বাসে লোকজন পোলাপানের বিদায় করে দিয়ে জয়নাবকে বলল লেবুর সরবত বানিয়ে সবুজকে খাওয়াতে।

লেবুর শরবত বানিয়ে নিয়ে এসে দিয়ে বলল, হাতপাখায় পাখা করতে। এই গ্রামে মসজিদ ছাড়া আর কয়েকটা বাড়িতে বিজলি আসে এখানে সিলিং ফ্যানও আছে কিন্তু কয়দিন ধরে যে কারেন্ট গেছে আর ফিরছে না—চোরাই কানেকশনের দশা। হাত পাখায় পাখা করতে থাকলে বললো কয়ায় গিয়ে বড় বালতিটার গোসলের পানি দিতে।

বড় বালতিটা ভরে গোসলের পানি দিলে বললো, সবুজের গায় মগ দিয়ে পানি ঢালতে।

মগ দিয়ে কিছুক্ষণ পানি ঢাললে বললো, ওর পিঠে সাবান মাখতে, গামছা দিয়ে ঘষতে।

গোসল শেষ করে এলে খাবার পালা। বল ভরে ভাত, হরেক রক বাটি ভরে তরকারি। মাছ ভাজা, ডাল, ঘরে পাতা দই। সবই এনে একে একে টেবিলে সাজিয়ে দিল।

পরীবানুর রোগশোক এমন করে পালিয়ে যাবে তা কে জানত। সবুজ খেতে বসলে ওর পছন্দের যা কিছু একটা একটা করে পাতে দেয় এবং জয়নাবকে আবার বাতাস করতে বললে সে সবুজের উপরে বাতাস করে একপাশে দাঁড়িয়ে। অল্প সময়ের মধ্যেই পোলাও পাকাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলো, আবু ফয়সল কোর্মার বাটি থেকে দু'টুকরো গোশত চামচের মধ্যে তুলে নিতে নিতে বললো, 'একটা সান্ধ্য কাগজে ছাপা হয়েছে

যা দেশের অর্ধেকের বেশি লোক একবেলাও খেতে পায় না। এ নিয়ে পলিটিসিয়ানদের মধ্যে জোর গুঞ্জন চলেছে। সামনে দুর্ভিক্ষ এড়াতে হলে লাখ-লাখ টন খাদ্য শস্য আমদানি করতে হবে। অবস্থা খুব খারাপ। ব্যবসা বাণিজ্য নেই, কলে-কারখানায় উৎপাদন নেই। আমরা কেমন করে বাঁচবো ?

'কি কস্ তুই বুঝি না।' পরীবানু বলল, 'খাইতে বস্‌ছস্ খা—অত চিন্তা কইরা তর কি লাভ।'

'কিন্তু মা চিন্তা আমাদের করতেই হবে—অনেক মূল্যে কেনা আমাদের স্বাধীনতা। তাকে নস্যাৎ হতে দিলে তো চলবে না। বিশ্ব আমাদের গায়ে থুথু ফেলবে, বলবে একটা অকর্মার জাত। স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়।'

এবার পরীবানু কিঞ্চিৎ গরম হয়ে উঠলো, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'দেশকে তোরা বড় করবি ক্যামনে, নারীজাতিকে পায়ের তলে দাবাইয়া রাখছস্ !'

'মা, তুমি ঠিকই বলেছ।' আবু ফয়সল মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'নারীসমাজ দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা। আমাদের অর্থনীতিকে তাদের সহযোগিতা ছাড়া শক্তিশালী করা যাবে না। কিন্তু কেউ কি কারুর মুক্তি এনে দিতে পারে ? ইতিহাসে দেখা যায় না। নারীর মুক্তি নারীকেই অর্জন করে নিতে হবে—'

আবোল-তাবোল আরো কতো কি বকে যেত, পরীবানু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'হুন খাওয়ার পরে ভালোমত একটা ঘুম দেগা যা। যে মশলা ছাড়ছস্ বিকাল বেলা দলে দলে মানুষ আইবো দেহিস। অহন একটু জিরাইয়া ল। জয়নাবরে আর ডাহাডাহি করিস্ না। আমরা এক-লগে বইয়া খাওয়া দাওয়া করুম—'

'ঠিক আছে মা, ঠিক আছে। জয়নাব এখন পাটরানী, ওকে বেশি ফরমাশ দেওয়া চলবে না, তা আমি জানি।'

ওরা তিনজনেই হেসে উঠল।

খাওয়া শেষ হলে পানদানে জয়নাবের বানিয়ে দেওয়া পুটপুটে পানের খিলির দু'তিনটি একসঙ্গে মুখে পুরে বাংলা ঘরে চলে গেল। কয়েকটি সিনেমা পত্র এনেছিলো, ব্যাগের ভিতর থেকে সেগুলো বার করে, তারপর শুয়ে শুয়ে পাতা উল্টিয়ে ছবি দেখতে থাকে—হেডিংগুলো যেমন চটকদার তেমনি হাস্যকর। কিন্তু এটা এক আলাদা জগৎ, বিনোদনের কল্পরাজ্য। সে রাজ্যে নায়কেরা প্রেম করে বাজার গরম রাখার জন্য, নায়িকারা পাত্র পাল্টায় সংবাদ শিরোনাম দখল করতে। সবটাই

কঠিন ব্যবসা। দেখতে-দেখতে একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে ওঠে আবু ফয়সলের ঠোঁটে, সে ভাবল রংবাজি চলছে চলুক, কিন্তু সংস্কৃতির মূল ধারাটাকে সজীব ও সঞ্জীবিত রাখা নতুন জেনারেশনের কর্তব্য এবং সঙ্গীত ও কবিতা সেখানে প্রধান দুই তরঙ্গ; চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন জোরদার করে সিনেমাকেও এদের সঙ্গে মেলাতে হবে। ধুত্তর, মগজটা যেন কেমন! বাজে ভাবনাই বেশি করে। সে কাগজগুলো নিচে ফেলে দিল, তারপর চোখ বুঁজে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে।

ফয়সল টের পায়নি, খাওয়া শেষ করে পরীবানু জলদি তার কামরায় চলে এসেছে জয়নাবকে সঙ্গে নিয়ে শিয়রের কাছে একটা চেয়ারে বসে পানের বাটা খুলেছে। তার ইঙ্গিতে মুখের উপরে মসৃণভাবে বেশি, কিন্তু ওর সারা শরীরেই বাতাস করতে লাগল।

পান চিবোতে চিবোতে ছেলের ঘুমন্ত মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পরীবানু এতো দেখেও যেন তৃপ্তি হয় না।

এক সময় ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ কি একটা খটকায় পড়েছে জয়নাব, পরীবানুকে আর বুবাই বলে ডাকতে পারছেনা। এখন ও বিনা সম্বোধনে বলল, 'জেওর কাপড় বদলাইয়া ফালাই গা অনেকক্ষণ তো অইলো—'

'খবরদার!' শাসিয়ে ওঠে পরীবানু, ছেলের ঘুম যাতে নষ্ট না হয় ফিসফিস করে বললো, 'আরো দিয়াম আরো পিন্‌বে। নতুন কাপড়, নতুন জেওর। সবুজ যদ্দিন বাড়িৎ আছে সাইজ্যা গুইজ্যা থাকবে তুই—জানসনা সবুজ কবিতা ল্যাহে বাপজানের দোস্ত কইত, কবিরা সুন্দরের পুজারী।'

'কিন্তুক—আমার শরম লাগে যে—'

'শরমে নারীর রূপ আরো ফুইট্যা উডে, বুঝলি?' জয়নাবের বা হাতটা ধরে পরীবানু, আদর করে বলল, 'ল যাই অহন কোমরে ব্যাদনাডা আবার উটতাছে একটু জিরাই গা—'

বিকেলের দিকে ঘুম পাতলা হয়ে এসেছিল, আধোতন্দ্রার ভিতরে শুনতে পায় কাছাকাছি অনেক লোকের কন্ঠস্বর।

গ্রামের কয়েকজন প্রবীন ব্যক্তি বাংলাঘরের বেতের চেয়ার ও টুলে বসে কথাবার্তা বলছেন; মসজিদের ইমাম সাহেবের গলা সবচেয়ে উচ্চ, তিনি ফতোয়া দিচ্ছেন, 'নাছারা! নাছারা! সব নাছারা কারবার। শরিয়তে বেদাত! ওয়াজ মাহফিলেও কতবার কইছি ছবি তোলা, ছবি ছাপা, পোলাপানরা খুউব লায়েক অইয়া গ্যাছে গা, কোনো কতায় কান দেয় না।'

'হেদিন জুম্মাবাদ আপনে তো কইছিলেন কেয়ামত ঘনাইয়া আইছে।'

'ঠিকই কইছিলাম। আর হেইড্যা কি আমার কতা হগলেই জানে,

ইমাম মেহেদি জারি অইয়া গ্যাছেন।'

'আমাগো একটা জোয়ান মাইয়ার ফটো ক্যালেন্ডারে ছাপা অইব আর হেইড্যা দেশেবিদেশে প্রচার অইব এইড্যা সইহ্য করা যায় না।'

'ঠিক কইছেন। তাইলে গেরামের মান ইজ্জত রইল কই একরকম যখন নানা মন্তব্য চলছে, আবু ফয়সল চৌকিতে উঠে বসল এবং পরক্ষণেই নিচে নেমে স্যান্ডেল পায়ে কোঠার খোলা দরজার কাছে টান হয়ে দাঁড়াল। সে ক্লিষ্টস্বরে উচ্চারণ করলো, 'আপনারা

ইমাম সাহেব বিনয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন, কাঁচুমাচু করে বললেন, 'ও সবুজ মিঞা। হুনলাম তুমি বাড়িৎ আইছ। অনেকদিন তো দেহি না, আইলাম তোমারে দেখতে—'

'ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।'

ফেলুগাজি বললেন, তা কতা অইল কি মিঞা দ্যাশটাতো জাহান্নামে যাইতাছে আমরা বুড়াথুড়ারা তোমরার মুহের দিহে চাইয়া আছি।'

আবু ফয়সল গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি আপনারা কেন এসেছেন। কিন্তু শুনুন, সামান্য জিনিশ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। নামাজ রোজা করছেন, করুন। এসব আপনারা ভুলে যান। তাছাড়া পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর ও সত্য সবই তো ধর্মের অঙ্গ।

কাদু মুনশী উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়া দিলেন, সমর্থন করে বললেন, 'ঠিক কইছ, নাতি ঠিক কইছ। আমাগো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইসালাম কইছেন, যদি জুটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি, আরেকটি যদি জুটে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী। খাদ্য দেহের ক্ষুধা মিটায় আর ফুল মনের ক্ষুধা খুব তো ফটংফটং করতাছেন, আপনে এসব কথা জানেন ?'

বারান্দা ও বারান্দার নিচে বাইরের প্রাঙ্গণ জুড়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা জটলা করছিল।

ঘরের ভিতরে সমবেত মুরুব্বীদের দিকে একবার তাকিয়ে ফয়সল আস্তে আস্তে বারান্দার দরজার কাছে এলো। একদল ছোকর চেঁচিয়ে বলল, 'পাটরানী, পাটরানী!' অন্য সবাই একসঙ্গে আওয়াজ দেয়, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ একজন চিৎকার করে বলল, 'পাটরানীর ছবিডা আমায় দ্যাহান ফয়সল ভাই

ইমাম সাহেব উঠে পড়লেন, বললেন, লন আমরা যাই—পোলাপানদের সাথে গরম আবার ইডালতে না শুরু করে।'

ওরা দলবেঁধে ভিতর বাড়ির দরজা দিয়ে উঠানে নামলেন, এবং ক্ষণ দিকে চলে গেলেন। মেয়েরা জড় হয়েছিল, তাদের কেউ কেউ

মুখে আঁচল চেপে হাসতে লাগল। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ফয়সল ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললো, শোনো তোমরা, আমরা এক জাতি এক মানুষ। প্রবীণদের অনেক অভিজ্ঞতা, তাদের উত্তম উপদেশ আমরা শুনবো। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি, তাহলে দেশের মঙ্গল।'

'আমরা আপনের কবিতা শুনবো, ফয়সল ভাই। একটা কবিতা আবৃত্তি করেন না!'

আবু ফয়সল একটু কি ভাবল, তারপর হাত উঁচিয়ে জোরে জোরে বলল, 'ঠিক আছে। তবে শোনো, নজরুলের বিদ্রোহীর স্তবক। বল বীর! বল উন্নত মমশির। শির নেহারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির—'

হঠাৎ থেমে গেলে আবার দাবি, 'আরও আরও—'

'আমি ক্লান্ত, বেশি পারবো না। আরেকটু শোনো মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হব শান্ত—যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না। বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেইদিন হবো শান্ত—

শেষ হতেই ছেলেরা হইচই করে হাততালি দিয়ে উঠল। ওদের পানে তাকিয়ে নিরবে হাসে আবু ফয়সল, তারপর হাত নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে ভিতরে চলে এল।

আওতার কাছে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ভিড় করে দাঁড়িয়ে জয়নাবও মুগ্ধনেত্রে সব দেখছিলো; ওর ইচ্ছে হচ্ছিলো, ছুটে যায় ওই জমায়েতের মাঝখানে, ওদের অভিনন্দন গ্রহণ করে। কিন্তু কিছু পারলো না।

ক্রমে রাত হয়ে আসে; গ্রামের পিছনের খামার জোড়া জলরাশি, রেললাইন এবং তার পরেরও গ্রাম গ্রামান্ত ছাড়িয়ে যে পশ্চিমাকাশ সেখানে ধূমশূর্ম পাহাড়ের মতো মেঘের আড়ালে অস্তসূর্যের রক্তিমাভাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়! স্তব্ধ হয়ে আসে মানুষের কণ্ঠস্বর, পাখির কলকাকলি। আবছায়া অন্ধকার। ঝোপেঝাড়ে জলার কাছে পোকা-মাকড়ের টিপ্‌টিপ্‌, ঝিপ্‌ঝিপ্‌।

গায়ে একটা ছেড়া কাঁথা জড়িয়ে তামাক খাচ্ছিল ইয়াকুব, কুপিটা জ্বলছে।

জয়নাব কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওকে দেখে তার চক্ষু হানাবড়া; হুকোর ছিদ্র থেকে মুখ তুলে বললো, 'একি জয়নাব! তুই—'

জয়নাব আস্তে জবাব ছিল, 'বিবিসাব ধইরা পিন্ধাইয়া দিছে, যতসব পাগলামি।'

'এত জেওর কাপড়-- ওরা ভালামাইনষি করবো তোরে! মতলবডা কি?'

'তার আমি কি জানি।' মুখ নিচু করে থাকে জয়নাব, আবার বললো, 'কপাইল্যা মানুষ–'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কইছস্।' এতক্ষণে ইয়াকুব যেন পরিষ্কার বুঝতে পারে, আনন্দিত হয়ে বলতে থাকে, 'আল্লাহ্ পইসা দিছে হাত একটু কাইত করলেই অনেক। তবে বড় লোকদের আবার ডর লাগে। আমরা কাম করি, খাই, কিন্তু স্বাধীনতা জুদি আরাইতে হয় তাহলেই বিপদ। একমাত্র স্বাধীনতাই আমাগো সম্পত্তি।'

'অত বক্‌বক্ কইরো না বাজান, চুপ অইয়া থাহ।' জয়নাব জিগগেস করল, 'কুইশ্যারি ইছা তো পায় নাই–রুছমত ভাই কই গেল?'

'মেঘনাৎ খুব বুরাইছে তো, শরীলডা ওর ভালা না।'

'আমি আগেই কইছিলাম! যতসব বাহাদুরি। বোয়ালমাছে যে গিলছে না এই যথেষ্ট।' রাগলে এমনি বিদঘুটে কথা বলে জয়নাব, সে একটা ঝ্যাংড়া মেরে উঠল এবং উঠান দিয়ে হেঁটে গিয়ে পূর্বভিটির ছোটঘরে প্রবেশ করে।

গলা ইস্তক কাঁথা টেনে চুপচাপ শুয়ে ছিল রুছমত, সে ঘুমাচ্ছে না; বরং বড় চোখে তাকিয়ে আছে কাঠের ধর্ণায় আঠা দিয়ে লাগানো লালনীল কাগজের নকশার দিকে, এগুলো ইব্রাহিমের স্মৃতি। বড় শৌখিন ছেলে ছিল। বেচারা, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু দেশটা কি দিল তাকে? মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাতেও নাম তুললো না। সালঙ্করা জয়নাব ভিতরে গিয়ে সামনাসামনি দাঁড়ালে ওর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তেমনি স্থির, রুছমত একটু নড়ল চড়ল না। গোঁফের নিচে প্রায় অস্পষ্ট তিক্তহাসির রেখা।

'এই অসময়ে হুইত্যা রইছ ক্যান, কি অইছে তোমার? গাঙে ডুইব্যা মরতে চাইলে ক্যাডা আর ধইরা রাখতে পারবো।' ঠোঁটজোড়া মৃদু-মৃদু কাঁপছে, বুকের ভিতরে সামলে রাখা অনেক বেদনা, দ্রুত বেরিয়ে আসার আগে এক নিঃশ্বাসে বলল জয়নাব, 'আমারে ভুইল্যা যাও রুছমত ভাই। আমারে তুমি ভুইল্যা যাও। তুমি আমারে পাইবা না।'

'হুঁ, এইতো নারীর আসল রূপ, কোন্ যাত্রায় যেনো দেখেছিলো ছলনাময়ী ও আলেয়া। বড়লোকের বাড়ির কাপড় জেওর পরে সব ভুলে গেছে জয়নাব, খুব তেজ হয়েছে তার। কিন্তু তার ওপরেও বেশি, মেঘনা

থেকে ফিরে বাংলাঘরে ঢুকে পড়েছিলো, তখন দু'জনকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দেখেছে।

নদীর তলদেশে কিসের ঢুঁশ খেয়ে তিন নম্বর চাঁইয়ের অংশ ভেঙে গেছে, সেটা নিয়ে এসেছে মেরামত করার জন্য। ওইতে মেঝেতে পড়ে আছে। বেত তোলাই আছে; ঠিক করতে বেশি সময় লাগবে না, কাল দুপুরে আবার যাবে সে মেঘনার সেই জায়গায়, ডুব দিয়ে আবার চাঁইটা পাত্‌বে। তখন যদি আর না ওঠে? অন্তঃ স্রোতের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে চলে যায় অনেকদূরে সাগরের কাছে মেঘনায়? তন্দ্রায় চোখজোড়া লেগে চলে দুঃসপ্নের ছায়ার মতো দেখে এলোমেলো মোহিনীমায়ার অপরূপা জলপরী তাকে শাদা শাদা দুই হাতে সহজভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শোঁ শোঁ ধ্বনি অতল পাতালের দিকে।

আবার উঠান মাড়িয়ে জয়নাব কাছে গেলে ইয়াকুব মাঝি বললো, 'এই জঞ্জাল খুইল্যা দিয়া আইগ্যা মা, আর দেরি করিস না। অলঙ্কার গতরে রাখা বিপদ, চোরচোট্টা আস্‌তো পারে।'

'যাইতাছি বাজান।' জয়নাব ম্লান মুখে বলল, 'আমি তো চাই নাই বিবিসাব জোর কইরা পরাইয়া দিছে।'

'পরাইছে ভালা করছে, অহন ফেরত দিয়া আইলেই অইলো। তুই আজগা ও-বাড়িৎ থাহিস্‌ না।'

জয়নাব উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'আইচ্ছা বাজান। তুমি জিরাও আমি মা'রে লইয়া আইতাছি।'

তখন সবেমাত্র বাজার থেকে ফিরে সুরুজ মিঞা আলমারি খুলে টাকার পোটলা রেখেছে। হঠাৎ রিনিঝিনি আওয়াজ শুনে চমকে উঠে পিছনে তাকালো। একি! এ কে? জোয়ান কালের পরীবানু? সারা অঙ্গে ঝিক্‌মিক্‌ অলঙ্কার, পরনে পাটের শাড়ি—যৌবনের সেই স্মৃতি তো ভুল হবার নয়? কিন্তু বয়স্কা পরীবানু তো এখন রান্নাঘরে, তার গলা শোনা যাচ্ছে। টেবিলের উপর থেকে হারিকেনটা হাতে তুলে সলতে বাড়িয়ে দেখে বিস্মিতস্বরে উচ্চারণ করল, 'কে তুমি? জয়নাব!

আর কিছু বলতে পারলো না, সহসা তীব্র কামনায় উদ্দীপ্ত চোখ-জোড়া উত্তেজিত বাঘের চোখের মতো জ্বলতে লাগল।

উপসংহার—

আজ পহেলা ভাদর। দুপুর পর্যন্ত ঠা ঠা রোদ ছিল, দুপুর গড়িয়ে গেলে সারা আসমান জুড়ে ধোঁয়াটে আবরণ কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ পুঞ্জ পুঞ্জ আদিগন্ত কালো মেঘ জমে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। যেদিকে

ডাকানো যায় ভরা বর্ষার বিপুল জলরাশি থইথই করছে বড় নৌকো পাল গুটিয়ে ভিড়ছে এদিকে পাড়ের দিকে এবং মোহনার কাছে ছোট ছোট ফেরায় ডিঙি অতিশয় তৎপর শোয়ারীদের ঘাটে ঘাটে পেঁছে দেওয়ার জন্য। ভয়ঙ্কর তুফানের আলামত বজ্র, বৃষ্টি ও বর্ষণে দুনিয়া সয়লাব হয়ে যেতে পারে। মেঘনা ব্রীজ সাইলো ও এদিকে সার কারখানা আসন্ন দুর্যোগের নিচে স্তব্ধ হয়ে আছে ঠিক, এবং ভৈরব বন্দরের দালান-কোঠা সারি সারি সমুন্নত; কিন্তু এদিকে ওদিকে গ্রামের দরিদ্র বাঁশ ও ছনের ঘর যেন কাঁপছে। এমন ঝড় বৃষ্টিতে কতো যে ভেঙে পড়ে, কতো উড়ে যায়, লেখাজোখা থাকে না।

দুপুরের পর পরই ফিরেছে বাজার থেকে, খাওয়ার পরে নিবিষ্টমনে ধূমপান করছিলো, বাসার বাইরে তাকিয়ে মনে মনে ভীষণ খুশি সুরুজ একটা অদম্য ইচ্ছাকে ঠোঁটের উপরে আবার অস্পষ্ট শব্দে আওড়ালো। গত রাতটা অসহ্য চট্‌ফটানিতে কেটেছে চোখের কাছেও একফোঁটা ঘুম আসেনি। ওদের খাওয়াবার পর একে একে অলঙ্কারগুলো খুলে দিয়েছিলো জয়নাব, পরীবানু আপত্তি সত্ত্বেও, রান্নাঘরের কোণে গিয়ে পাটের শাড়িও বদলে নিজের লাসসবুজ চেক শাড়িটা পরে এসেছিলো। এই খারাপ সময়ে জেওরপত্র গায়ে নিয়ে শোওয়া ঠিক না, ওর যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য, সে বাড়িতে চলে যায় ঘুমোবার জন্য বাংলা ঘরে গ্রামের পোলাপান নিয়ে ফয়সলের হই চই চলছিলো। ওরা নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান চালাবার কর্মসূচী নিচ্ছিলো। ক্রমে রাত গড়িয়ে চলে, এবং শেষে বাড়িটা যখন ঝিমঝিম, আস্তে আস্তে কপাট খুলে বেরিয়ে জয়নবদের কুটিরের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। কিন্তু দুর্যোগ ছাড়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা তো সম্ভব ছিলো না।

সেই সুবর্ণ সুযোগ এসেছে আজ সন্ধ্যের বালক মাঝি কোরবান এসে সুরুজকে যখন খবর দিচ্ছিল, সান্নামত ভৈরব বাজারে এসেছে, বেড়ার কাছে কান পেতে শুনেছিল। এতে আরো সুবিধে হয়েছে। যদি এসেই থাকে, দু'একটি রাত হিরণবালার ওখানে না কাটিয়ে সে নড়বে না. আর এদিকে তার আবরণটা ভালোই কাজে লাগবে মনে হয়।

এর পরের কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। একটানা গুড়গুড় ধ্বনিও বিজলি চমকানির অনেকক্ষণ ধরে আয়োজনের পর দুপুর রাতের শেষে যখন ঘোর আঁধারে প্রবল শোঁ শোঁ শব্দে, কখনো ধাক্কা মেরে কখনো ঘূর্ণিচক্রের মতো ঝড় বইতে লাগল, তখন ইয়াকুব মাঝির বারান্দায় একটি ছায়ামূর্তি তার মাথা ও মুখের অংশ কাপড়ে ঢাকা। বাঁশের বেড়ার ফাঁকে বগল অবধি সবটা হাত ঢুকিয়ে সে সাবধানে খিলটা খুলে

ফেললো এবং হয়াকুব মাঝির শিয়রের মাটিতে পাতা চাটাইয়ের উপরে কাঁথা বিছিয়ে শোওয়া জয়নাবকে কোলপাজা করে তুলে থপ্‌থপ্‌ পায়ে বাইরে চলে আসে। তখন বাতাস আরো প্রবল; চেতনা হয়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে জয়নাব, চিৎকারও করে, কিন্তু কিছুই শোনা গেলো না ঘরে বাইরে কোণের আড়ালে নিয়ে মাটিতে চিতিয়ে ফেলে এবং একটা উন্মত্ত প্রাগৈতিহাসিক লোমশ জন্তুর মতো থাবার নখড়ে কাপড়-চোপড় ছিড়ে ফেলে চাপে ওর উপরে।

ওদিকে পূবেভিটির ছোট ঘরের দরজার কাছে ঘাপটি মেরে বসে রুছমতকে নিয়ে ডাগার হাতে বসে অপেক্ষা করছিলো আবু ফয়সল হঠাৎ একবার বিজলির আলোকে দেখে দৌড়ে এল। তক্ষুণি ঝাপিয়ে পড়লো। পিঠের বাঁদিকে প্রবল বিক্রমে আমূল বসিয়ে দিলে একটা তীব্র আর্ত-চিৎকার। কলজে ছ্যাঁদা করে হয়তো বুকের দিকে বেরিয়েছে; চরম আক্রোশে ফয়সল উচ্চারণ করল, 'জাহান্নামে যা, শয়তান সান্নামত

অন্ধকারে, জয়নাবকে ছেড়ে দিয়ে, বুকের বাঁদিকটা দু'হাতে চেপে কুঁকড়ে যায়, কঁকাতে কঁকাতে আর্তস্বরে কোনো রকম বলতে থাকে লোকটা, 'আমারে মাইরা ফালাইলি। আমারে মাইরা ফালাইলি রে সবুজ। আমি যে তোর বাজান রে! আমারে মাইরা ফালাইলি!'

'মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। তুই ডাকাত সর্দার সান্নামত।' আবু ফয়সল কথা শেষ করার আগেই রুছমত দৌড়ে গিয়ে হারিকেনটা নিয়ে এসেছে; দ্রুত সলতেটা বাড়িয়ে নিচু করলে ওরা দেখল, সুরুজ মিঞার মুখ। বিপর্যস্ত, বিকৃত। আবু ফয়সল ডুকরে উঠে বলল, 'বাজান। তুমি তুমি কেন!'

'তোর মায় ঘৃণা করতো, কাছে জায়গা দিত না।' বলতে বলতে কয়েকবার মোচড় খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো। আবু ফয়সল পিতার উপরে লুটিয়ে পড়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে তখন ঝড়ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়, সজোরে বাতাস ও বর্ষণে অন্ধকার পৃথিবী একাকার, যেমন লুপ্ত হয়ে গেছে।

এলাকার একজন গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডে চতুর্দিকে চাঞ্চল্য জাগল। সারা গ্রাম ভেঙে পড়ে; এবং বেলা দশটার মধ্যেই বন্দর ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক এসে জড়ো হল। বাইরের প্রাঙ্গণে, বাংলা ঘরে, উঠানে বারান্দায় লোকারণ্য। বারান্দার কাছে চৌকিতে একটা চাটাইয়ের উপরে শুইয়ে রেখেছে, সবাই

ঠেলাঠেলি এগুতে চাইছে এক নজর শেষ দেখা দেখার জন্য। একজন প্রবীণ বললেন, 'এমন দয়ালু ও চরিত্রবান লোক আর জন্মাবে না।'

পা বাড়ালেই ভৈরব কিন্তু এ গ্রাম ভৈরব থানার আওতাধীনে নয়। খবর পাওয়ার পর রায়পুরা থেকে দলবল নিয়ে দারোগা আসতে বারোটা বেজে গেল। মোস্তাজ, ইন্নাস, কোরবান এগিয়ে আসে স্বেচ্ছাসেবক হিশেবে, লোকজন কিছু সরিয়ে লাশের কাছে টেবিল চেয়ার পেতে দেয়। দারোগা সাহেব প্রাথমিক বিবৃতি লিখলেন। তারপর কিছু-কিছু লোককে জেরা করতে থাকেন। কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসেছিলো প্রিয়বন্ধু কেরু মিঞা, বিমর্ষমুখ আক্ষেপ করে বলল, 'গতকাল, সোনালী ব্যাংক থেইক্যা তিরিশ হাজার ট্যাহা তুইলা আমার ওহানে গ্যাছল। কইল ঢাহার বাড়ির চুনকাম ও ফিটিং-এর লাইগ্যা দরকার। আমি গাইল দিলাম, কইলাম অতো নগদ ট্যাহা—একটা ড্রাফট্ বানাইয়া লইয়া যা। না হুনবো ক্যারে, মরবো যে। কইলো ড্রাফট্ ড্রুফট্ বোঝে না। ব্যাস্, কারবার খতম। নিশ্চয় রাইতে ডাহাইত্ আইছিলো—'

কেরু মিঞা হুঁশিয়ার আদমী, ঠোঁটের কাছে এসে গেলেও সান্না-মতের নাম উচ্চারণ করল না। কি জানি কি বিপদ হয়।

তার বিবৃতির কিছু প্রমাণ আছে, ওই যে আলমিরা খোলা তছনছ, একশ' টাকা পাঁচশ' টাকার নোটগুলো ছড়ানো ছিটানো। কেউ জানে না, সকালের দিকে খবর পেয়ে যখন গিয়ে দৃশ্যটা দেখলো, থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিলো পরীবানু—জলদি ফিরে এসে নিজের হাতে এগুলো করেছে।

ইয়াকুব মাঝির ঘরের বাইরে পাওয়া গেছে রক্তের দাগ, বৃষ্টিতে সব ধুয়ে নিতে পারেনি। ওদের ডাকা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। ইয়াকুব মাঝি, আমিরন, জয়নাব। টেবিলের কাছাকাছি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। পিতার মাথার কাছে থ' মেরে বসে আছে আবু ফয়সল, নিঃশব্দে কাঁদছে।

সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে, একজনের পরে একজন। সময় বয়ে চলেছে, রৌদ্রের নিচে উৎসুক জনতা। হঠাৎ এক অদ্ভুত চিৎকার, উঠানের মাঝখানে ভিড়ের ভিতর থেকে মাথা উঁচু করে হাত নাড়ছে, পরিচিতেরা দেখলো, রুছমত। সে চেঁচিয়ে কি বললো প্রথম, বারবার দু'হাতে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো। সবাই চেয়ে আছে এখন তার দিকে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, রুছমত নিজে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে, জয়নাব চরম বিষণ্ণ বেদনার্ত, নতমুখ। দু'জনের চোখাচোখি

হল একবার।

ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় হয়ে ভাসে রুছমতের চিবুক সে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'এত লেইখ্যা কি অইবো দারোগা সাহেব। আমি জবানবন্দী দিতাছি। সান্নামত গেরামে আসে নাই, তদন্ত কইরা দেখতে পারেন। সুরুজ মিঞা সাহেবরে আমি খুন করছি—'

হঠাৎ তড়াক্ করে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক বিদ্ধ করে তীব্রতিক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল, 'আবু ফয়সল, না— !'

পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল পরীবানু, স্থির শান্ত স্নিগ্ধ চেহারা, দু'হাতে ছেলেকে ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'শইলডা তোর ভালা না বাবা, পালঙ্কে একটু হুইত্যা থাক্।'

অবশেষে নৌকায় লাশ চালান করে থানা কর্তৃপক্ষ চলে গেলে, সারা বাড়ি আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যায় এবং তখনো পালঙ্কে শুয়ে আবু ফয়সল, মূর্ছিত হওয়ার মতো অস্বাভাবিক, তন্দ্রামগ্ন। শিয়রের কাছে বসে পরীবানু, হাত বুলাচ্ছে বুকে মাথায় কোকড়া চুলে আদর করছে। একলা, জয়নাব এসে দাঁড়াল। এ বার ওকে চেয়ে দেখল পরীবানু, আঁচলের খুট থেকে চাবির রিংটা খুলে দেয়, কি ইঙ্গিত করে। জয়নাব বুঝতে পারে সে ইঙ্গিত, হেঁটে গিয়ে আলমারি খুলল। আবার চোখ ইশারা করে পরীবানু, জয়নাব জেওর পোটলা ও পাটের শাড়িটা ধরে নিয়ে আসে। পরীবানু আবার সংকেত করলে তাড়াতাড়ি আড়ালে গিয়ে সব পরে কাছে এল জয়নাব। কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত, শিহরিত। এবার ছেলেকে ঠ্যালা দিয়ে জাগায় পরীবানু, বলল, 'বাবা সবুজ চোখ ম্যালে, দ্যাখ ক্যাডা আইছে ! তোর পাটরানী !'

আবু ফয়সল চোখ মেলে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকানমাত্র যেন একটা জোর নাড়ায় বাঁধ ভেঙে যায়, জয়নাব ফয়সলের বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রবলভাবে আকুলি-বিকুলি রোদন করতে লাগল, 'না !'

ওকে বুকে চেপে ধরে এক সময় অস্পষ্ট বিড়বিড় করে ফয়সল, 'আমি আদালতে বলবো আমি খুনী।'

এবার জয়নাবের আর্তধ্বনি, না ! না ! না !'

আস্তে আস্তে উঠে পরীবানু বারান্দায় হেঁটে চলে গেল। পরে বারান্দা থেকে উঠানে যায়; উঠান থেকে বাংলা ঘরে, বাংলা ঘর থেকে বাইরে প্রাঙ্গণে, যেখানে আমগাছের তলে ছপ্‌ছপ্ পানির শব্দ হচ্ছে। কি দোলায় আলোড়িত পরীবানু দড়ি খুলে ডিঙিটা ভাসিয়ে দেয়, যা অল্প অল্প বৈঠা নাড়ায় অনেকক্ষণে মোহনার কাছে এসে পড়ল। এখন একটু

জোড়ে, বৈঠা নাড়ছে পরীবানু—বাঁদিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, দূরে পঞ্চবটিতে তাদের বাড়ি আবছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে। ক্রমে মাঝগাঙে চলে যায় ডিঙিটা এবং সেখান থেকে, দক্ষিণা বাতাসের চাপে রাতের আকাশের নিচে নির্জনতায় উত্তর দিকে ভেসে চলল। উত্তর দিকে এ নদীর গতি দু'তিন দিনের পথ; তারপর দক্ষিণে মোড়, যার দূরবর্তী অনেক নিচের ভাটিতে সাগর দিগন্ত জোড়া অনন্ত ঢেউরাশি থই থই করছে।

———

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999